দীপক চৌধুরী

বিহার সাহিত্য ভবন (প্রাইভেট) লিঃ
৩, ভবানী দত্ত লেন ॥ কলিকাতা-৭

বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ, ৩, ভবানীদত্ত লেন,
কলিকাতা—৭ হইতে শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী কর্তৃক প্রকাশিত।
প্রথম প্রকাশ—৭ই জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৪
২১শে মে—১৯৫৭

প্রচ্ছদপট—শ্রীসুবোধ দাশগুপ্ত

মূল্য—দু'টাকা বার আনা

শ্রীগোপাল প্রেস, ১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা—৪ হইতে
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীবিনয় ঘোষ

বন্ধুবরেষু—

লেখকের অন্যান্য গল্পের বই

দীপক চৌধুরীর গল্প

কেষ্টনগরের পুতুল

এক

সকালের দিকেই আলমারিটা এসে পৌঁছল। সঙ্গে একটা কাঠের বাক্সও ছিল। রেল-স্টেশনের মালগুদামে জিনিস দুটো পড়ে ছিল প্রায় পনেরো দিন থেকে। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সনাতন মিত্র এবং তাঁর স্ত্রী ইরা মিত্র দু জনেই জিনিস দুটোর কথা ভুলে গিয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মনে থাকবার কথা নয়। আলমারি কিংবা কাঠের বাক্সের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। সম্পত্তি দুটো ইরা মিত্রের। গতকাল সাহেবের টাইপিস্ট অনাথ গাঙ্গুলীই মেম সাহেবকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিল, "মাশুল দিয়ে মাল দুটো ছাড়াতে হবে। এর ওপরে ডেমারেজ তো লাগবেই।"

"ডেমারেজ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এত দিন তবে কি করছিলেন ?"

"রসিদটা যে আপনার কাছে রয়েছে।"

"ছি ছি, পনেরো-ষোল বছর আগেকার—।" কথাটা শেষ না করে মেম সাহেব ঢুকে পড়লেন শোবার ঘরে। একটু পরেই

পুনরায় ফিরে এসে তিনি বললেন, “এই নিন রসিদ আর টাকা। কাল সকালেই মাল দুটো নিয়ে আসবেন।”

“হ্যাঁ।”—রসিদ আর টাকা হাতে নিয়ে অনাথ গাঙ্গুলী বলল, “চাটুজ্জে কোম্পানি থেকে একটা ট্রাক ভাড়া নিয়ে নেব।”

“না না”—বাংলোর বারান্দায় চেয়ার কখানা পাতাই ছিল। মিসেস মিত্র বসে পড়লেন চেয়ারে। একটু দম নেওয়ার জন্যেই যেন তাঁকে বসতে হল। অনাথ গাঙ্গুলী অপেক্ষা করছিল। মিসেস মিত্র বললেন, “পনেরো-ষোল বছর আগেকার পুরনো জিনিস আমার কোন কাজেই লাগবে না। কলকাতা থেকে কি যে দরকার ছিল এগুলো পাঠাবার—সেখানে তো পুরনো জিনিস অকশন হয়। না অনাথবাবু, ট্রাক ভাড়া করবার দরকার নেই। ঝুটমুট পয়সা নষ্ট করবেন না, একটা ঠেলাগাড়ি করে মাল দুটো নিয়ে আসবেন।”

“এই শহরেও দোকান আছে, অকশন হয়। যদি বলেন—”

“বাংলা দেশের শহরগুলো সবই তো ঘুরলুম। দোকান কিছু কম দেখি নি অনাথবাবু। কি অকশন হয় এখানে?”

“চেয়ার, টেবিল, আলমারি—”

“তা আমিও জানি। কিন্তু বর্মা টিকের আলমারি এসব মফস্বল শহরে পাওয়া যায় না। যান, ডেমারেজ দিয়েই আলমারিটা খালাস করে নিয়ে আসুন। বর্মা টিক বলেই লোকসানটা হয়তো গায়ে লাগবে না। কুলিরা যেন সাবধানেই

মালটা নাড়াচাড়া করে। সামনের দিকে কাচ আছে। একটু দাঁড়ান।"—মিসেস মিত্র চোখ বুজে নতুন তথ্যের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। অনাথ গাঙ্গুলী দাঁড়িয়ে রইল। বেশিক্ষণ নয়, একটু বাদেই ইরা মিত্র বললেন, "হ্যাঁ, চারটে শেল্‌ফ্‌ই আছে।"

"আপনি তো কাচের কথা বলছিলেন, মেমসাহেব!"

"কেন বলছিলাম? সাবধান হওয়ার জন্যে। মাল বয়ে বয়ে কুলিগুলোর হাত-পা সব লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে। কাচের ওপর যেন হাত না রাখে ওরা। স্ক্র্যাচ পড়তে পারে। প্রায় সতের বছর আগে বাবা এটা কিনে দিয়েছিলেন, আমি তখন আই, এ, পড়ি। একটু দাঁড়ান।'

পুনরায় চোখ বুজলেন মিসেস মিত্র। অনাথ গাঙ্গুলী রসিদ-খানা ভাঁজ করে পকেটে রাখবার সময় পেল। একটু বেশি সময়ই পেল সে। টাকাগুলোও সাবধানে ভরে রাখল পার্সের মধ্যে।

"হ্যাঁ, মনে পড়েছে।"—মিসেস মিত্র চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন, "প্রথম তাকটায় এক ইঞ্চিও ফাঁক ছিল না। আমার সব জন্মদিনের উপহার থাকত তাতে। বাকি তিনটে শেল্‌ফ্‌ও ভর্তি ছিল। যাক, আগে আলমারিটা নিয়ে আসুন, তারপর দেখবেন। কুলি ব্যাটাদের একটু সাবধানে কাজ করতে বলবেন। কাচের ওপরে যেন দাগ না পড়ে। বিলিতী কাচ, দশ গুণ দাম দিলেও আজকাল আর বিলিতী কাচ পাবেন না।

স্কটিশে যখন বি, এ, পড়তুম তখন চার নম্বর শেল্‌ফ্‌টাতে জিনিস জমতে লাগল। এখন থাক্‌, কাঠের বাক্সটা আগে আসুক তারপর সব হিসেব করে দেখব। বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন আমার কোন ভয় ছিল না। একটা জিনিসও নড়চড় হয় নি, খোয়া যায় নি। চার নম্বর শেল্‌ফ্‌টা—। সাহেব এলেন বুঝি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা হলে আপনি আসুন। আরও টাকা লাগবে না কি ?"

"ঠেলাগাড়ির ভাড়া লাগবে।"

"ঠেলাগাড়ি ? ট্রাকের কি হল ? বেশি ভাড়া লাগে আমি দেব। ঠেলাগাড়িতে জিনিস সব এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। ভেঙে যেতে পারে। না, আপনি বরং চাটুজ্জে কোম্পানি থেকে একটা ট্রাকই ভাড়া নিয়ে নেবেন।"

"সাহেব আসছেন, আমি এবার চলি।"—চলে গেল অনাথ গাঙ্গুলী।

বাংলোর বারান্দায় চেয়ার তো পাতাই ছিল। মিস্টার মিত্র অফিস থেকে ফিরছেন। প্রতিদিনকার মত স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আজ আর তিনি ঘরের ভেতরে গেলেন না। বসে পড়লেন বারান্দায়। একটু বাদেই ইরা মিত্র এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনে। বললেন তিনি, "আজ বুঝি খুব বেশি কাজ করতে হয়েছে ? পুরো জেলাটা শাসন করা তো সোজা কাজ নয় !

নাও, এটুকু খেয়ে নাও। তারপর কাপড়চোপড় ছাড়বে, ভাল করে খাবে।"

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে মিত্র সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "অনাথ এসেছিল কেন?"

'আমিই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আলমারি আর বাক্সটার কথা তুমি তো ভুলে গিয়েছিলে। এখন কেবল মাশুল দিলেই চলবে না, ডেমারেজও দিতে হবে।"

"আইন ভাঙলেই শাস্তি পেতে হয়, এ তো জানা কথা—" মিস্টার মিত্র সিগারেট ধরালেন। চা শেষ হওয়ার আগে সিগারেট শেষ হল। মিত্র সাহেবের মনে উদ্বেগ। ইরা দেবীও বুঝতে পারলেন তা। পনেরো বছর একসঙ্গে বাস করছেন। স্বামীর উদ্বেগটুকু বোঝবার জন্যে তাঁকে যদি আরও পনেরো বছর একসঙ্গে বাস করতে হয়, তা হলে বিয়ে করবাব দরকার ছিল কি? উপন্যাস পড়েই তো রোমান্টিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করা যেত। দেহের নৈকট্যও সম্মিলিত-জীবনের সবটুকু নয়, মনের সঙ্গে মনের আত্মীয়তা স্থাপনের যুগ্ম-প্রচেষ্টার পথটিও তৈরি হওয়া চাই। ইরা দেবী বি, এ, পাস করেন নি বটে, কিন্তু পথ তৈরির শিক্ষা তাঁব আছে। বি, এ, পাস কবেন নি তার কারণ তিনি পরীক্ষা দিলেই পাস করতে পারতেন। সনাতন মিত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল বলে পরীক্ষার প্রশ্নই আর উঠল না।

বাকি চা-টুকু এরই মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। টিন থেকে দ্বিতীয় সিগারেট বার করছিলেন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট। মিসেস

মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "এত কি ভাবছ? কলকাতা থেকে কেউ আসছেন না কি? মন্ত্রী-টন্ত্রী?"

"নাঃ"—মিত্র সাহেব মেরুদণ্ড সোজা করে খাড়া হয়ে বসলেন,"আলমারিটা রাখবে কোথায়? বসবার ঘরে তো জায়গা নেই?"

"আমার বেড-রুমেই থাকবে। আমি যখন আই, এ, পড়ি, বাবা তখন এটা কিনে দিয়েছিলেন চল্লিশ টাকা দিয়ে। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বলে দাম অত সস্তা ছিল। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কি?"

"সতেরো বছর আগে টাকার দাম ছিল অনেক বেশি। ইংরেজরা গেল, আর কাগজের টাকা সস্তা হল। কংগ্রেসের মন্ত্রীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কত রীম কাগজে কত টাকা ছাপা যায় তার হিসেব তো সব আই, সি, এস-দের মাথায়। না না, তোমাদের আপত্তি আমি শুনব না। ওঁরা শুধু মন্ত্রী, আর কিছু নন। তোমরা আই, সি, এস, তোমরাই সব। এই জন্যে আমি গোড়াতে আপত্তি জানিয়েছিলাম, আই, সি, এস, বিয়ে করতে চাই নি।"

"অপেক্ষা করলে একজন মন্ত্রীকেই বিয়ে করতে পারতে"—হেসে উঠলেন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট।

"মন্ত্রী বিয়ে করতে যাব কোন্ দুঃখে? আমি কি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারতুম না? স্কটিশে কি ছেলের অভাব ছিল?"

ভুল পথে চলে এসেছেন বুঝতে পেরে মিসেস মিত্রই আবার

বললেন, "এই দেখ, বউদির চিঠিখানা তোমায় পড়িয়ে শোনানো হয় নি। আলমারিটা ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে বউদি আমায় চিঠি দিয়েছিলেন। শুনবে চিঠিখানা ? আমার বাপের বাড়ির কোন খবরই তো তুমি শুনতে চাও না। অথচ ওই বাড়িতেই আমার জীবনের বাইশটা বছর কেটেছে।"

"জীবনের ওইটেই সব চেয়ে ভাল সময়। তোমার একলার নয়, সবারই—" সিগারেটের ছাই ফেলতে ফেলতে মিস্টার মিত্রই আবাব বললেন, "চিঠিখানা আন না, দেখি।"

চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন মিত্র সাহেব। বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল তাঁর। একটা পুরো জেলা শাসন কববার ঝক্কি বড় কম নয়। চব্বিশ ঘণ্টাই সতর্ক এবং সজাগ থাকতে হয়। পাঁচটার পবে অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন বটে, কিন্তু কাজ থেকে মুক্তি পান না তিনি।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মিসেস মিত্র বললেন, "শোনবাব মত তেমন কোন খবর নেই এতে।"

"তোমার দাদা বউদি ভাল আছেন তো ? চিঠিখানা পড।"

ইরা মিত্র এবার পড়তে লাগলেন চিঠি : ঠাকুবঝি, তোমার সেই পুরনো আলমারিটা গতকাল শেয়ালদা স্টেশন থেকে বুক করে দিয়েছি। আলমারিতে যে সব জিনিস ছিল, সেগুলো পাঠাবার জন্যে একটা কাঠের বাক্স কিনতে হল। কোন জিনিসই নষ্ট হয় নি। শ্বশুর মশাই যত দিন বেঁচে ছিলেন, তত দিন

আমরা কেউ তোমার আলমারিতে হাত দিই নি। তিনি মাঝে মাঝে আলমারিটার দিকে চেয়ে বলতেন যে, তোমার জীবনের বাইশটা বছর নাকি শেল্‌ফ্‌ চারটেতে সাজানো আছে। একটা বছরও তা থেকে খোয়া যায় নি। তোমার মায়ের মৃত্যুর পরে ফার্ন প্লেসের ফ্ল্যাটটা তাঁর কাছে অত্যন্ত ফাঁকা ফাঁকা ঠেকত। শেল্‌ফে সাজানো বাইশটা বছর তোমার তাঁর শেষ জীবনের শূন্যতাকে যে আংশিক ভাবে ভরাট করে রেখেছিল তা আমরা জানতুম। তিনি আর নেই। ফার্ন প্লেসের ফ্ল্যাটে আমাদের স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। তোমার মনে আছে কি না জানি না যে, দক্ষিণ দিকের সবচেয়ে ভাল ঘরখানাতেই বাবা থাকতেন। ঘরখানা ভাল কিন্তু বড় নয়। মোট আয়তন এক শো কুড়ি বর্গ ফুট। তা থেকে তোমার আলমারিটার জন্যে মোটামুটি পনেরো বর্গ ফুট ছেড়ে দিতে হয়েছিল। উঁচুর দিকেও প্রায় সাত ফুট। উনি বললেন যে, হিসেব ছাড়া আধুনিক সভ্যতা এক পাও এগুতে পারে না। সেই জন্যেই ভাই হিসেব পাঠালুম। আলমারিটার জন্যে খানিকটা জায়গা নষ্ট হচ্ছিল। বিংশ শতাব্দীর বিরাট বিরাট শহরে যারা বাস করে তারা জানে যে, এক ইঞ্চি জায়গা নষ্ট করাও পাপ। আজকাল পাপপুণ্যের হিসেব করেন বৈজ্ঞানিকেরা। সাধুসন্ন্যাসীরা নন। তোমাদের মফস্বল শহরে বিজ্ঞান এখনও প্রবেশ করতে পারে নি, তাই অনেক জায়গা, অনেক আলো আর প্রচুর হাওয়া সেখানে তোমরা পাও। আলমারিটা তোমার সাজিয়ে রাখতে কোন অসুবিধে হবে না।

হলেও পাঠিয়ে আমরা দিতুমই। তোমার জীবনের বাইশটা বছর দক্ষিণ দিকের ঘরটায় সাজিয়ে রাখতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু আলমারিটার ডিজাইন বড্ড সেকেলে। মনে হয়, ওটা আসবাব নয়, জেলখানা। তা ছাড়া, ফার্ন প্লেসের ফ্ল্যাট থেকে একটা অংশ তোমার দাদা সাব-লেট করছেন। সব সুদ্ধ আড়াইখানা ঘর। ভাড়া পাওয়া যাবে এক শো পঞ্চাশ। আমরা পুরো ফ্ল্যাটের ভাড়া দিই এক শো ত্রিশ। ঠাকুরঝি, কেমন আছ? মিস্টার মিত্র তো মস্ত বড় একটা জেলা শাসন করছেন। কিন্তু নিজের সংসারটা এমন ফাঁকা কেন? ছেলেপুলে কই? বয়-বাবুর্চির সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি? আলমারিটার প্রাপ্তি-সংবাদ দিয়ো। ইতি—

চিঠিখানা টেবিলের ওপর ফেলে রেখে ইরা মিত্র বললেন, "বড় শহরের মানুষ যে কত স্বার্থপর হতে পারে তা এই চিঠিখানা পড়লেই বোঝা যায়।"

"কেন?"— প্রশ্ন করলেন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট।

"ফ্ল্যাটের আড়াইখানা ঘর সাব-লেট করবে বলেই বউদি আমার আলমারিটা পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"অন্যায় কিছু করেন নি তিনি—" মিত্র সাহেব উঠলেন, "তোমার স্মৃতির আলমারি অপর লোকে বয়ে বেড়াবেন কি করে? তা ছাড়া প্রথম যৌবনের স্মৃতি কেবল ভারি হয় না, মজবুতও হয়।"—এই বলে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। ইরা দেবী সহসা একটু বিব্রত বোধ করলেন।

মফস্বল শহরে আলো এবং বাতাসের এত প্রাচুর্য, অথচ একটা মুহূর্তের ব্যবধানে যেন সারা বাংলোটার চারদিকে অন্ধকার নেমে এল। হাওয়ার গতি পর্যন্ত অবরুদ্ধ। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট যেন ঠেলা দিয়ে ইরা দেবীকে ঢুকিয়ে দিলেন স্মৃতির জেলখানায়। প্রথম যৌবনের দিনগুলি বুঝি জেলখানার গরাদের মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর চোখের সামনে।

হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে মিত্র সাহেব বললেন, "ছটা বাজল। একটা জরুরি তদন্তের জন্য মহাদেবপুর যাচ্ছি।"

"মহাদেবপুর।"—আশ্চর্য বোধ করলেন ইরা দেবী।

"হ্যাঁ। সাব-ডিভিশন শহর। লঞ্চে করে যেতে হবে। রাত আটটার মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যাব। ফিরব কাল।"

"কাল গেলে কি হয় না?"

"না। একটা গোপন-তদন্তের ব্যাপার আছে। মহাদেবপুর সাব-জেলটা বিনা নোটিশে পরিদর্শন করব। অনাথকে দিয়ে আলমারিটা আনিয়ে নিয়ো। অত গম্ভীর হয়ে রইলে কেন? আমি যে তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলুম তা কি তুমি বুঝতে পার নি, ইরা?"

দুই

সকাল সাড়ে দশটার মধ্যেই অনাথ গাঙ্গুলী আলমারি আর বাক্সটা পৌঁছে দিয়ে গেছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলোতে। ইরা দেবীর শোবার ঘরেই আলমারি রাখা হয়েছে। কাঠের বাক্সটাও খুলে দিয়ে গেছে টাইপিস্ট অনাথ গাঙ্গুলী। মিসেস মিত্র এবার রয়ে-বসে জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রাখবেন। টাকার হিসেবটা এখন থাক্, পরে দিলেই চলবে। কিছু বাড়তি টাকাই খরচ হয়ে গেছে। ডেমারেজ বেশি লাগল। গতকাল যা সে হিসেব করে নিয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে ভুল ছিল। তা হোক, মেম সাহেবকে বললেই তিনি দিয়ে দেবেন। এখন তিনি চানঘরে গেছেন। বিকেলবেলা তো তাকে একবার আসতেই হবে। সাহেব বোধ হয় বিকেলের আগে মহাদেবপুর থেকে ফিরতেও পারবেন না। অনাথ গাঙ্গুলী নেমে এল একতলায়।

মিসেস মিত্র চানের ঘরে গিয়ে গান ধরেছেন। হাল্কা সুরের আধুনিক গান। এত হাল্কা যে এ-গান তাঁকে শিখতে হয় নি। কলকাতা-বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রচারিত কি একটা আওয়াজ কবে একদিন তিনি রেডিওর সামনে বসেই তুলে ফেলেছেন গলায়। খুব বেশি অন্যমনস্ক না থাকলে এমন গান গাইতে তাঁর লজ্জাই করত। বোধহয় লজ্জা তিনি

পেয়েছেন। চানঘরের একটা মাত্র জানলা, তাও তিনি বন্ধ করে দিলেন।

ইরা দেবী চান করছেন। শতছিদ্রের ঝরনা দিয়ে জল পড়ছে মাথায়। চুল ভিজল, দেহ ভিজল। সুর দিয়ে মন ভেজাবার চেষ্টা করছিলেন তিনি। হঠাৎ তাঁর সন্দেহ হল, দেওয়ালেরও বোধ হয় কান আছে। বেতারকেন্দ্রের আওয়াজ দিয়ে তিনি আর দেওয়ালগুলোকে বিক্ষত করতে চাইলেন না। চান শেষ হল। এবার আলমারিটাকে গুছতে হবে।

গুছতে বসলেন মিসেস ইরা মিত্র। প্রথম শেল্‌ফ্‌টাতে কি ছিল? কাঠের বাক্সটা হাতড়াতে লাগলেন তিনি। খেলনা-গুলো কই? ওমা, এই তো সান্‌টা ক্লস! দাড়িটা কোথায় গেল? বাবার সেই পাদ্রী-বন্ধুটির কাছে এটা তিনি উপহার পেয়েছিলেন বড়দিনের সময়। মিসেস মিত্রের তখন সাত বছর বয়স। সেই বয়সের মধ্যে অনেক রকমের খেলনা তিনি উপহার পেয়েছিলেন। কাঠের বাক্স থেকে এক এক করে খেলনাগুলো তিনি বার করতে লাগলেন। ঘোড়ায় চেপে রাজকুমার ছুটছে। হাতে তার তরোয়াল। তার সামনে বসে কে? ওমা, এ যে রাজকুমারী! কেষ্টনগরের মাটির পুতুল বটে, কিন্তু বড়পিসীমা বলতেন, এর পেছনে ইতিহাস আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস। মেঝেতে বসে বসেই মিসেস মিত্র শতাব্দী পার হতে লাগলেন। অনেকগুলো শতাব্দী পার হয়ে এসে তিনি উপস্থিত হলেন এক স্বয়ম্বরসভায়। কোথা থেকে

কি হয়ে গেল। সংযুক্তা কই? দেওয়াল টপ্‌কে পৃথ্বিরাজ ঢুকে পড়েছেন বড় হল-ঘরটায়। পলক ফেলতে না ফেলতে তিনি সংযুক্তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন রাজবাড়ির বাইরে। বড়পিসীমা বলতেন, পৃথ্বিরাজের কোন অপরাধ ছিল না। তিনি শুধু পুরুষমানুষ ছিলেন না, বীরপুরুষও ছিলেন। আজকাল তো কলকাতার ফুটপাতে পুরুষমানুষের মিছিল চলেছে দিনরাত, কিন্তু বীরপুরুষ কই? ধুতি-পাঞ্জাবি পরে কেউ প্রাচীর টপ্‌কাতে পারে না কি? নীলকণ্ঠ কেবিনে হাফ-কাপ চা খেয়ে খেয়ে গোটা জাতিটাই যে নীল হয়ে উঠল রে! পিসীমার কথা শুনে সেই বয়সেও ইরা দেবী হেসে হেসে লুটিয়ে পড়তেন ফার্ন প্লেসের ফ্ল্যাটে। ইতিহাস বদলে গেল। জয়চাঁদের গোঁয়ারতমি ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করল। থানেশ্বরের মাটি বিক্ষত হল বিদেশীর অশ্বক্ষুরে। ভারতবর্ষের হাওয়ায় কাপুরুষতার বিষ পড়ল ছড়িয়ে। কিন্তু হেদোর পূব দিকে স্কটিশ চার্চ কলেজে কি হল? ফার্ন প্লেসেরই বা ইতিহাস কি? ফ্ল্যাট বাড়িটার চারদিকে তো দেওয়াল পর্যন্ত ছিল না। ঘোড়া কিংবা তরোয়ালেরও প্রয়োজন হত না। কার্তিকের মত ময়ূরের পিঠে চেপে ফার্ন প্লেসের মোড়ে এসে অপেক্ষা করলেই ইরা দেবী বেরিয়ে আসতে পারতেন বিবাহ-বাসরের বাইরে। সীতাংশু সত্যিই কাপুরুষ ছিল। অতএব নতুন ইতিহাস আর লেখা হল না। মিসেস মিত্র মাটির পুতুলটা তুলে রাখলেন এক নম্বর শেল্‌ফে। কৈশোর পার হয়ে এলেন ইরা দেবী। প্রথম ও

দ্বিতীয় শেল্‌ফ্‌ ভর্তি হয়ে গেল। একটা খেলনাও খোয়া যায় নি।

কাঠের বাক্সে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ইরা দেবী পুনরায় অনুসন্ধানের কাজ শুরু করলেন। ভাপসা গন্ধ বেরুচ্ছিল। প্রথম যৌবনের বিস্মৃত-প্রায় ঘটনার গায়ে ছাতলা পড়েছে। গোটা দুয়েক রামায়ণ আর মহাভাবত বার করলেন তিনি। বাবার কথা মনে পড়ল তাঁব। প্রবেশিকা পবীক্ষার পরে তাঁকে শাড়ি পবতে হল, বাবা ভয় পেলেন। কলেজ স্ট্রীটেব বইয়ের দোকান ঘুরে ঘুরে তিনি নানা রকমের রামায়ণ মহাভাবত কিনে আনলেন। সচিত্র রামায়ণখানাব চিত্রগুলোব কথা ইরা দেবী সারাজীবনেও ভুলতে পারবেন না। রাম-সীতার ছবি দেখে বড়পিসীমার সে কী হাসি। আপাতত তৃতীয় নম্বব শেল্‌ফে রামায়ণ আর মহাভারতগুলো সাজিয়ে বাখলেন তিনি। কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে বাবা প্রায়ই নতুন নতুন বই কিনতে লাগলেন। ছোট বড় সাইজের দুখানা গীতা উপহার পেলেন প্রথম বার্ষিক শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই। একটা শেল্‌ফ্‌ তাতে ভর্তি হল না। সাধু সন্ন্যাসী আব সিদ্ধপুরুষদেব জীবনী কেনা যখন বাবার শেষ হল, তখন তো ইরা দেবী স্কটিশে বি,এ, পড়ছেন।

বাক্সটার সামনে বসে মিসেস মিত্র পেছন দিকে দৃষ্টি ফেললেন। শতাব্দী নয়, কয়েকটা বছর মাত্র তাঁকে পার হতে হল। বি, এ, ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন। সীতাংশুর সঙ্গে পরিচয়

হতে খুব বেশি সময় লাগল না। ক্লাসের মধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে ভাল ছেলে। হঠাৎ একদিন ইরা দেবী দেখলেন, তৃতীয় নম্বর শেল্‌ফ্ আর তাঁর মাঝখানে সীতাংশু এসে দাঁড়িয়েছে। বাবার পরিকল্পিত পৃথিবীকে অস্বীকার করছে সীতাংশু। ক্রমে ক্রমে গোটা শেল্‌ফ্‌টাই ইরা দেবীর দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হল। বাবা সব জান্‌তে পারলেন। দেখতে পেলেন তিনি, আলমারির চার নম্বর তাকে নতুন একটা জগতের গোড়াপত্তন হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের বুকে সীতাংশুর স্বাক্ষর !

একটা বাজল। দেওয়াল-ঘড়ির দিকে চেয়ে মিসেস মিত্রের মনে পড়ল স্বামীর কথা। মহাদেবপুরের তদন্ত কি তাঁর শেষ হয় নি ? তা হলে বোধ হয় এ বেলা তিনি আর ফিরলেন না। বাক্সের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন ইরা দেবী। বাক্সটা ফাঁকা। চার নম্বর শেল্‌ফের জন্যে কি রইল তাঁর ? কিচ্ছু না। পাওয়ার লোভে আঙুলগুলো ছটফট করতে লাগল। ছুটে বেড়াতে লাগল ফাঁকা-বাক্সের অন্ধকারে। স্মৃতির কুটো পর্যন্ত হাতে ঠেকল না তাঁর। তিনি বুঝলেন, প্রথম প্রেমের স্বাক্ষর হাতে না ঠেকলেও মনের আলমারিতে পরিচয় তার পাকা।

ইতিহাসের পাতা ওলটাতে লাগলেন ইরা মিত্র। বি,এ, পরীক্ষার আগেই চার নম্বর শেল্‌ফে আর জায়গা রইল না। সীতাংশুর উপহার দেওয়া বইগুলোর দিকে চেয়ে বাবা তাঁর কর্মসূচী ঠিক করে ফেললেন।

ফাল্গুনের এক দ্বিপ্রহরে সীতাংশু এল ফার্ন প্লেসের ফ্ল্যাটে। সেদিন তার হাতে ছিল সুধীন্দ্রনাথের 'উত্তর ফাল্গুনী'। দক্ষিণ দিকের ঘরটাতে ইরা দেবী থাকতেন। সীতাংশু বলল—

"সত্য কি বাস ভাল ?
নয়নে তোমার দেখি যে-রুচির আলো,
জ্বালাবে কি তাতে আরতির দীপ আমার তরে
মৌন, বিজন, মৌল নিশার নিলাজ দ্বিপ্রহরে ?"

বইখানা ইরা দেবীর হাতে তুলে দিয়ে সীতাংশু হঠাৎ আলমারিটার দিকে দৃষ্টি ফেলল। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "চার নম্বর শেল্‌ফের বইগুলো কোথায় গেল ?" ইরা দেবী জবাব দিয়েছিলেন, 'বাবা সব সরিয়ে ফেলেছেন। আজ থেকে ঠিক সাত দিন পরে আমার বিয়ে।"

খবর শুনে সীতাংশুর মুখ গেল শুকিয়ে। শুকনো মুখটাই সে কোঁচা দিয়ে বার বার মুছতে লাগল। ক্যালকাটা ট্রাম কোম্পানির প্রথম শ্রেণীতে চেপে 'উত্তর ফাল্গুনী' হাতে নিয়ে ফার্ন প্লেসের ফ্ল্যাটে সবাই আসতে পারে। কিন্তু ওই মাটির পুতুলটার মত ঘোড়ায় চেপে হাতে তরোয়াল নিয়ে এখানে আসতে পারে কজন ? তবু সারা দুপুরটা ইরা দেবী কাটিয়ে দিলেন প্ল্যান করতে করতে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, সীতাংশুর সঙ্গেই ইরা দেবীর বিয়ে হবে। থাকবার একটা জায়গা ঠিক হলেই, সীতাংশু এসে ফার্ন প্লেসের মোড় থেকে ইশারা করবে। ইরা দেবী বেরিয়ে আসবেন বাড়ির বাইরে।

তার পর? জয়চাঁদের মত বাবা যে তাঁর লড়তে পারবেন না তা তো ইরা দেবী জানতেনই। জয়চাঁদ ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে মহম্মদ ঘোরীকে ডেকে আনতে পেরেছিলেন, বাবা তাঁর রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ট্রাম-রাস্তাও পার হতে পারবেন না। সাতটা দিন অপেক্ষা করলেন ইরা দেবী। দক্ষিণ দিকের ঘরটার জানলা থেকে ফার্ন প্লেস আব রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর মোড়টা দেখা যায়। তিনি চেয়ে রইলেন সেই দিকে। সীতাংশু এল না। সনাতন মিত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তাঁর। স্বামীর সঙ্গে ঘব করছেন তিনি, তাও পনেরো বছব হল। মুক্তি পেয়েছেন মিসেস মিত্র। জযচাঁদেব চেয়ে বাবার বুদ্ধি ছিল বেশি। কাউকে তিনি ডাকতে যান নি, শেল্‌ফ্ থেকে শুধু সীতাংশুব দেওযা বইগুলোকে সরিয়ে ফেলেছিলেন বাবা। সীতাংশুব স্মৃতি-মুক্ত ফাঁকা শেল্‌ফ্‌টার দিকে চেয়ে মিসেস মিত্রের আজ নতুন কবে প্রশ্ন জাগল মনে, শেল্‌ফ্‌টা কি সত্যিই ফাঁকা?

আলমারিটা এখানে এসে না পৌঁছলে এমন প্রশ্ন হয়তো সারা জীবনেও তাঁর মনে আসত না। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারতেন না যে, শেল্‌ফ্‌টার শূন্যতায় মনটা তাঁর কয়েদির মত আবদ্ধ হয়ে আছে। বউদি বোধ হয় ঠিকই লিখেছেন, আলমারিটা আসবাব নয়, জেলখানা। তবে কি তিনি স্বামীর প্রতি অবিচার করছেন? বিবাহিত-জীবনের পনেরোটা বছরই কি ফাঁকি?

অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন মিসেস মিত্র। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। স্বামী তো তাঁর এখনও ফিরলেন না। তিনি এখানে উপস্থিত থাকলে হয়তো তাঁর মনের সমস্যা এমনভাবে জটিল হয়ে উঠত না। এখন তিনি কি করবেন ? এত বেশি ডেমারেজ দিয়ে আলমারিটা না আনলেই হত। টাকার ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েছে। দাম্পত্য-জীবনের ক্ষতি যেন না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ইরা মিত্র চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর শয়ন-কামরার হাওয়া ক্রমশই দূষিত হয়ে উঠছে। বৈজ্ঞানিকদের হাতে কতটা কি আছে তা তিনি জানেন না। কিন্তু পাপপুণ্যের সমুদয় হিসেব যে তাঁদের হাতে নেই তা তিনি বুঝতে পারছেন ক্রমে ক্রমে। বউদি লিখেছেন—তোমাদের মফস্বল শহরে বিজ্ঞান এখনও প্রবেশ করতে পারে নি। পারে নি, তাই বা তিনি স্বীকার করবেন কেন ? চার নম্বর তাকটা তো শূন্য নয়। কুমারী-জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাটা কি ওখানে আবদ্ধ হয়ে নেই ?

ইতিহাসের পাতা ওলটাতে লাগলেন ইরা মিত্র। বিজ্ঞান এখন থাক। আকাঙ্ক্ষাটার মূলে গিয়ে পৌঁছবার চেষ্টা করতে হবে। মূলের সন্ধানটা জানা হয়ে গেলে পুনরায় বিজ্ঞানের মধ্যে ফিরে আসা যাবে। বিবাহিত জীবনের পনেরোটা বছর তিনি কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারেন না। স্বামীকে তিনি ঠকান নি, স্বামীকে তিনি ভালবাসেন।

পিসীমার কথা মনে পড়ল তাঁর। শতাব্দী পার হতে হল না। পিসীমা গল্প শোনাচ্ছেন ইরা দেবীকে। তিনি তখন সাত বছরের বালিকা। কেষ্টনগরের পুতুলটা সামনেই পড়ে রয়েছে। পিসীমা বলছেন, পৃথ্বিরাজ কেবল পুরুষমানুষ ছিলেন না, বীরপুরুষও ছিলেন। বিদেশীর অশ্বক্ষুরে থানেশ্বরের মাটি কতটা যে বিক্ষত হয়েছিল সে কথা তাঁর মনে নেই। কিন্তু ইরা দেবীর মনে আছে, স্বয়ম্বরসভায় যে-মানুষটি তরোয়াল হাতে নিয়ে ঢুকে পড়েছিল, সেই মানুষটিই বিংশ শতাব্দীর ফার্ন প্লেসের ফ্ল্যাটে আসত 'উত্তর ফাল্গুনী' হাতে নিয়ে। সেই অতি-পুরাতন পুতুলটারই নাম বোধ হয় সীতাংশু দত্ত।

ঘেমে উঠেছেন মিসেস মিত্র। বিস্ময় তাঁর কম নয়! চতুর্থ তাকটা সত্যিই ফাঁকা। আলমারিটার প্রথম তাকেই সমস্যার শেকড় গজিয়েছে। পুতুলটা মাটির বটে, কিন্তু পিসীমা কি তার গায়ে-পায়ে রক্ত-মাংস সৃষ্টি করেন নি? সারা জীবন ধরে ইরা দেবী বোধ হয় সেই পুতুলটা নিয়েই খেলা করছিলেন। এবার এটা ফেলে দেবার সময় হয়েছে। মেঝে থেকে উঠে পড়লেন ইরা মিত্র। বাবার ভুল তিনি ধরে ফেলেছেন। চার নম্বর শেল্‌ফের বইগুলো তিনি পুরনো বইয়ের দোকানে বেচে দিয়েছিলেন। ইতিহাস তাতে বদলায় নি। পনেরো বছর পরে আজ তিনি ইতিহাসের নতুন অধ্যায় লেখবার সুযোগ পেয়েছেন। মহম্মদ ঘোরীর সাম্রাজ্যে আর প্রবেশ করবার প্রয়োজন নেই। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সনাতন মিত্রের সাম্রাজ্য তিনি দেখতে পেয়েছেন।

পুতুলটা এবার সরিয়ে ফেলা দরকার। অনাথ ? অনাথ গাঙ্গুলী কোথায় গেল ? এত বেশি ক্ষতিপূরণ দিয়ে জিনিসগুলো আনবার দরকার ছিল কি ? রেল-কোম্পানির রসিদটার কথা তিনি তো ভুলে গিয়েছিলেন। অনাথ গাঙ্গুলীই তো তাঁকে আজ এমন বিপদে ফেলেছে। মিসেস মিত্র এগিয়ে গেলেন আলমারিটার দিকে। প্রথম নম্বর তাক থেকে পুতুলটা বার করে নিয়ে এলেন। পুরনো পুতুল। ভেঙে-চুরে গেছে। তা যাক। এটাকে এখন ফেলবেন কোথায় ? জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন তিনি। ও-পাশে তো ফুলের বাগান। কাঁচ কচি ঘাসের মাথাগুলো এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। শক্ত কঠিন মাটিতে ছুঁড়ে না মারলে পুতুলটা তো ভাঙবে না। কিন্তু পুতুলটা ভাঙলেই কি বালিকা-বয়সের ছবিটা তাঁর মুছে যাবে ? মাটির ঢেলাটা তো ভাঙাই, ছবিটা তার স্থায়ী। কি করবেন তিনি ? অস্থির হয়ে উঠলেন ইরা দেবী।

পুতুলটা হাতে নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। ওখান থেকেই ডাকতে লাগলেন, "অনাথবাবু, রঘুবীর—"

মিত্র সাহেব সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিলেন। ইরা দেবী দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন, "এত দেরি করলে কেন ?"

"মহাদেবপুরের জেলখানায় বড্ড বেশি গোলমাল চলছিল।"

"বড্ড বেশি ? কত বেশি ?"—অদ্ভুত রকমের প্রশ্ন করলেন ইরা দেবী।

মিত্র সাহেব হাসতে হাসতেই বললেন, "কয়েদিদের জীবন যে কত দুর্বিষহ তা তো তুমি জান না, ইরা। সব কিছু তদন্ত করতে হল। হাতে ওটা কি তোমার ?"

"পুতুল। কেষ্টনগরের পুতুল।"

"বউদি পাঠিয়েছেন বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

মিত্র সাহেব একটু অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কাঁদছ যে ? ছেলেবেলাকার পুতুলটা ভেঙে গেছে বুঝি ? এস, আমি এটা জোড়া লাগিয়ে দিই।"—এই বলে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট জড়িয়ে ধরলেন ইরা দেবীকে। স্বামীর দিকে চোখ তুলে মিসেস মিত্র এবার বললেন, "ভারতবর্ষের ইতিহাসে একদা এর নাম ছিল পৃথিরাজ। আজকে এর নাম পালটে দিলুম।"

পুতুলটাকে ফেলে দেবার আর প্রয়োজন হল না। মিত্র-সাম্রাজ্যে পুরনো পুতুলেরই নাম রইল সনাতন মিত্র।

বন্ধু নীরেন বসু

অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে সানাই বাজতে শুরু করেছে। ঔপন্যাসিক অভয়পদ সরকার বিছানায় শুয়েই সহসা কি একটা হিসেব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বিয়ের মাস। প্রকাশকের দোকানে ভিড় জমতে আরম্ভ করছে। কত বই বিক্রি হলে কত টাকা রয়েলটি আসবে, তার হিসেব তিনি করছেন গত কাল থেকে। ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে হিসেবের অঙ্ক কষছেন তিনি। রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর ছাদের ওপরে সামিয়ানা টাঙানো হচ্ছে। কাল দুপুরবেলা কলেজ স্ট্রীটে প্রকাশকের দোকানে যাবার পথে তিনি দেখেছেন, এক শো ত্রিশ নম্বর বাড়ির সামনে তিনখানা ঠেলাগাড়ি। গাড়ি-ভর্তি চেয়ার। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক চেয়ার আসবে। বড়লোকের মেয়ের বিয়ে। শ পাঁচেক লোক নিশ্চয়ই নেমন্তন্ন খাবেন। প্রত্যেকের হাতে থাকবে উপহার। কাপড়-গহনার সঙ্গে ভদ্রলোকেরা দু-দশখানা উপন্যাস কি আনবেন না? নিশ্চয়ই আনবেন, ভাবলেন অভয়পদ সরকার। ভাবতে ভাবতে ভুল করে প্রায় ট্রামে উঠে পড়েছিলেন। বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়েছিলেন পায়ে হেঁটে কলেজ স্ট্রীটে যাবেন বলে। নিজের সঙ্গে গল্প করতে করতে কয়েক মাইল রাস্তা হাঁটা এমন কিছু

কষ্টের কাজ নয়। ঠেলাগাড়িতে এতগুলো চেয়ার দেখে এবার তিনি রাস্তা হাঁটবার ভাল কাজ পেলেন। প্রতি বিয়েতে যদি গড়ে পাঁচখানা করে তাঁর উপন্যাস বিক্রি হয়, তা হ'লে পুরো অগ্রহায়ণ মাসটায় ভাগ্য তাঁর কেমন যাবে? শতকরা কুড়ি টাকা তাঁর রয়েলটি। বুড়ো আঙুলটা বাকি চারটে আঙুলের মাথায় ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে তিনি রয়েলটি হিসেব করছেন আর আধ ঘণ্টায় সতেরো শো ষাট গজ রাস্তা অতিক্রম করছেন। এক ঘণ্টা পরে গলা শুকিয়ে এল অভয়পদবাবুর। পকেট থেকে দু কোয়া কমলালেবু বার করলেন তিনি। ছ পয়সা দিয়ে তিন দিন আগে লেক মার্কেট থেকে একটি কমলা কিনেছিলেন। নাগপুরের বাগানে কমলালেবুটি জন্মেছে বলে এর দাম ছ পয়সা। দার্জিলিঙের কমলা দু আনার কমে কেনা যায় না। দার্জিলিং আমাদের গ্রীষ্মকালের রাজধানী। তাই সরকারি আভিজাত্যের সার পেয়ে প্রতিটি কোয়ার মধ্যে দু পয়সার বেশি রস জন্মায়। তার·ওপরে গভর্নমেণ্টের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমৃদ্ধি রয়েছে দার্জিলিঙের কোয়ায়, ভাবলেন অভয়পদ সরকার।

সন্ধ্যের একটু আগেই তিনি এসে পৌঁছলেন কলেজ স্ট্রীটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক দিয়ে ছাত্র এবং ছাত্রীরা বেরিয়ে আসছে দেখে অভয়বাবু গায়ের চাদরটা ঘোমটার মত করে কপাল পর্যন্ত টেনে দিলেন। কেউ যদি চিনে ফেলে তা হলে আর লজ্জার সীমা থাকবে না। লজ্জা তবু তিনি

কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। ইস্ট বেঙ্গল সোসাইটির জুতোবিভাগের সামনে দেখা হয়ে গেল অধ্যাপক কল্যাণ মিত্রের সঙ্গে। আধুনিক বাংলার বড় পণ্ডিত কল্যাণবাবু। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর ভারতবর্ষে মেয়েরা কি ধরণের অলঙ্কার পরতেন তাই নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন।

"আরে অভয়পদ যে। মাথায় ঘোমটা দিয়েছ কেন?" জিজ্ঞাসা করলেন অধ্যাপক কল্যাণ মিত্র।

"লজ্জা করছে তোমাদের ফটকের সামনে দিয়ে যেতে।" জবাব দিলেন অভয়পদ সরকার।

"কেন, লজ্জা কিসের? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িটা কি তোমার পছন্দ নয়? এর স্থাপত্য-শিল্প ভারতীয় ঐতিহ্য বহন করছে।"

"আমি দেখি নি।"

"কেন?" খুবই বিস্মিত বোধ করলেন কল্যাণবাবু।

মাথার চাদরটা ভুরুর ওপর পর্যন্ত টেনে দিয়ে অভয়পদ সরকার বললেন, "নিজের মুখের স্থাপত্য এত বেশি ভাঙাচোরা যে, কোন পণ্ডিতই ধরতে পারেন না আমি খ্রীষ্টপূর্ব কোন্ শতাব্দীতে জন্মেছিলাম। সেই জন্যে এখান দিয়ে যাওয়ার সময় মাথায় ঘোমটা দিয়ে যাই। ইদিকপানে একটু সরে এসো, তোমাদের ছাত্রীরা সব জুতো-বিভাগে ঢুকছেন।"

প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কল্যাণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "নতুন বই কি লিখছ?"

"বই লেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি।"

"সংসার চলছে কি করে ?"

"বছরে তিনখানা করে উপন্যাস তৈরি কার। আচ্ছা, এবার আমি যাই। প্রকাশকের দোকানে একটু কাজ আছে। বিয়ের সিজ্‌ন্‌ শুরু হয়েছে কি না।"

"ও, হ্যাঁ, অগ্রহায়ণ মাস এটা। সুলতার জন্যে বাবা বড্ড বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। গত পাঁচ বছব থেকে আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু সুলতা কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না। এবার আমরা ওর বিয়ে দেবই। মাঘ মাস পেরুতে দেব না। তুমি কবে বিয়ে করছ হে অভয়পদ ?"

"তিনশোখানা উপন্যাস তৈরি করতে পারলে বিয়ের তারিখ আমি বলতে পাবব। সুলতাকে বলো, একদিন যাব দেখা করতে।"

"এলে এ মাসের মধ্যেই এস। আমরা নতুন বাড়িতে উঠে যাব। অভয়পদ, সুলতা বলেছিল যে, তোমার নায়ক-নায়িকারা আজকাল কেউ বিয়ে করছে না। সবাই নাকি বছরেব পর বছর অপেক্ষা করে থাকছে ? কিন্তু সুলতা কার জন্যে অপেক্ষা করছে বলতে পাব ?"

"দেখি, ভেবে দেখি। এবাব আমি চলি।"—বিখ্যাত ঔপন্যাসিক অভয়পদ সরকার ঢুকে পড়লেন শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে।

প্রকাশকের দোকানে এসে তিনি দেখতে পেলেন,

কাউণ্টারের ওপর রঙ-বেরঙের উপন্যাস পড়ে রয়েছে। তাঁর নিজের বই ক'খানাও তিনি দেখলেন। প্রবীণ এক ভদ্রলোক বই কিনতে এসেছেন। দোকানের সামনে মস্ত বড় গাড়ি। ইচ্ছে করলে তিনি অভয়পদ সরকারের লেটেস্ট উপন্যাস 'ফাল্গুনের চাঁদ' বইখানার একটা গোটা সংস্করণই কিনতে পারেন। ত্রিশ অশ্বশক্তির গাড়িখানার পক্ষে একটা সংস্করণের ছু হাজার বই বহন করে নিয়ে যাওয়া খুব কিছু অসুবিধে হবে না। অভয়পদ সরকার সহসা মনে মনে ছু হাজার 'ফাল্গুনের চাঁদে'র রয়েলটি হিসেব করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে সেল্‌স্‌ম্যান কালীপদ একখানা 'ফাল্গুনের চাঁদ' ভদ্রলোকটির হাতে গুঁজে দেবার জন্যে বক্তৃতা শুরু করল, "বিয়ের উপহারের জন্যে লেখক এই বইটি বিশেষ যত্ন নিয়ে লিখেছেন। স্বামী-স্ত্রী ছুজনের পক্ষেই বইটি ভাল হবে স্যার। খবরের কাগজের সম্পাদকেরা বলেন, শরৎবাবুর পরে সাহিত্যসম্রাট হওয়ার একমাত্র যোগ্য লোক হচ্ছেন অভয়পদ সরকার। এঁর বই ছু মাসে একটা করে সংস্করণ হয়। খুব কাটতি স্যার। দিয়ে দি এক কপি?"

"না। হেমিংওয়ের বই দিন। ছু মিনিটে এক লাখ করে বিক্রি হয়।"

"তা হয়, কিন্তু আমাদের দেশ তো ততটা শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে নি। এখানে এক লাখ বছরে ছুজন করে মানুষ

বই পড়তে শেখে। হেমিংওয়ের কি বই দেব স্যার? 'কিলিমাঞ্জারো পর্বত-শৃঙ্গে বরফ'? আমেরিকার কাণ্ডই আলাদা। যেমন গাড়ি বিক্রি, তেমন বই বিক্রি। বিক্রির হার মিনিট হিসেবে চলে। আমাদের বিক্রি শতাব্দী গুনে গুনে। এই নিন হেমিংওয়ে। ক্যাশমেমো কাটব? সঙ্গে একখানা 'ফাল্গুনের চাঁদ দিয়ে দেব কি?"

অভয়পদ সরকার একটা আলমারির পেছনে বসে সংস্করণ-রহস্যের কথা ভেবে ঘেমে উঠছিলেন। স্নায়ুতন্ত্র তাঁর ক্রমশই অবশ হয়ে আসছিল। আত্মহত্যায় পাপ না থাকলে তিনি আজ লজ্জার দড়ি গলায় দিয়ে ঝুলে পড়তেন প্রকাশকেব দোকানে। সোনাব বাংলা নাকি ভারতবর্ষের সবচেয়ে শিক্ষিত প্রদেশ।

প্রকাশকের দোকান থেকে ফিরতে তাঁর একটু বেশি বাতই হয়ে গিয়েছিল। দূব তো কম নয়, কলেজ স্ট্রীট থেকে প্রিন্স গোলাম মহম্মদ বোড। নতুন গল্পের প্লট ভাবতে ভাবতে দু-এক মাইল হাঁটা যায়। কিন্তু ছ-সাত মাইল রাস্তা হাঁটতে গেলে এপিক উপন্যাসের প্লট ছাড়া কোন্ আহাম্মক পথ চলতে পাবে? কলেজ স্ট্রীটের আশেপাশে মাথা গোঁজবাব মত পাঁচ বর্গ ফুটের একটা গর্ত থাকলেও তিনি কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারতেন। শেষ পর্যন্ত তা আব হয়ে উঠল না। প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের এক-ঘরের ফ্ল্যাটে তাঁকে ফিরে আসতে হল।

হাড়ের ওপর বুভুক্ষার ছাতলা পড়েছে, তবু তাঁর বুর্জোয়া-রোগ সারল না। রাজপুত্র গোলাম মহম্মদের ক্রোড়ে তিনি ফিরে এলেন।

ফিরে এসে বাকি রাতটুকু তিনি আর ঘুমুতে পারেন নি। অনিদ্রা রোগটা আজ আর রোগ বলে মনে হয় না। ঘুম না এল তো ঔপন্যাসিক অভয়পদ সরকারের বয়েই গেল। ঘুমকে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন, জয় করেছেন বস্তুজগতের আরাম-আকাঙ্ক্ষা।

একতলার এই ঘরখানা তিনি ভাড়া নিয়েছিলেন পাঁচ বছর আগে। তখন সবেমাত্র তাঁর প্রথম বই বেরিয়েছে। হৈ-হৈ, রৈ-রৈ ব্যাপার! বাংলার সাহিত্য-মরুভূমিতে এ কোন্ মরূদ্যান? সেই সুযোগে তিনি প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের ঘরখানা ভাড়া করতে গেলেন। বাড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি নাম?”

“অভয়পদ সরকার।”

“কি করা হয়?”

কি জবাব দেবেন ভাবছিলেন অভয়পদবাবু। দরজার আড়াল থেকে বাড়িওয়ালার গিন্নী স্বামীকে বললেন, “তুমি না এম,এ, পি-এইচ, ডি,? অভয়পদ সরকারের নাম জানো না?”

“না তো।”

"উনি হচ্ছেন গিয়ে লেখক অভয়পদ সরকার।" বলতে বলতে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। অভয়পদবাবু হাত তুলে নমস্কার করলেন।

"আপনার উপন্যাসখানা আমি পড়েছি। পুঁটির বিয়েতে কে যেন উপহার দিয়েছিল। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় বইখানা আমি রেখে দিয়েছিলাম। চমৎকার লাগল! আর কি বই লিখছেন? আজ আসুন না সন্ধ্যের সময়, চা খাবেন?"

"ঘরখানার ভাড়া কত?" জিজ্ঞাসা করলেন অভয়বাবু।

এবার বাড়িওয়ালা বললেন, "ত্রিশ টাকা। সঙ্গে আপনার মেয়েছেলে নেই?"

"আজ্ঞে না।"

"বলেন কি!"—বাড়িওয়ালা যেন ভোরবেলা তৃতীয় মহাযুদ্ধেব ঘোষণা শুনলেন, "বলেন কি! বিয়ে কবেন নি?"

"না। বয়স আমার মাত্র পঁচিশ। তা ছাড়া ঘর যা দেখলুন, তাতে দুজনের পক্ষে নড়াচড়া করা খুবই অসুবিধে হবে।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "বাড়ির পেছন দিকে ঘর। বাড়িটা ছিল আমার স্বর্গীয় শ্বশুরের। ভাড়া দেবেন বলে তিনি বাড়ির প্ল্যান করেন নি। আসলে ওই ঘরখানা ছিল রান্নাঘর। আপনার মত রোগা মানুষেব পক্ষে খুব খারাপ হবে না।"

"আজ্ঞে না। আসলে আমি তো পুরো নই, আদ্ধেক মানুষ।"

"আপনার সংসারে আর কে আছেন?" জিজ্ঞাসা করলেন বাড়িওয়ালা।

"আমার সংসারে?"—একটু ভেবে নিয়ে অভয়পদ বাবু বললেন, "সংসারে আমার কাগজ আছে, কালি আছে—আছে আদর্শ এবং স্বপ্ন। নেই কেবল প্রোটিন।"

ভদ্রমহিলা এবার আনন্দের সুরে বলে উঠলেন, "খুব ভাল। উপন্যাস লেখবার পক্ষে ঘরখানা একেবারে আইডিয়েল।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ইন্ ফ্যাক্ট, উপন্যাস লেখবার জন্যে ঘরের দরকারই হয় না। দক্ষিণ-খোলা ঘরের দবকার হয় কেবল উপন্যাস পড়বার জন্যে। ছ মাসের ভাড়াটা তা হলে আগাম দিয়ে দিই?"

তারপরে পাঁচটা বছর কেটে গেছে রাজপুত্র গোলাম মহম্মদের গলিতে। পেছন দিকের ঘর বলে উপন্যাস লিখতে অসুবিধে হয় নি তাঁর। ছখানা উপন্যাস ওই ঘরখানা থেকেই বেরিয়েছে। চারদিক বন্ধ বলে স্বপ্ন কিংবা আদর্শের কোন ক্ষতি হয় নি অভয়পদ সরকারের। ক্ষতি যা হয়েছে সবটুকু তাঁর স্বাস্থ্যের। রয়েলটির টাকায় উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন তিনি আজও কিনতে পারেন না। ছোট ভাই তারাপদ মেডিকেল কলেজে পড়ছে। তার হস্টেল এবং

কলেজের সব খরচাই তাঁকে প্রতি মাসে যোগাড় করে দিতে হয়।

এম, এ, পি-এইচ, ডি, বাড়িওয়ালার এই ঘরখানা থেকে পৃথিবীর কোন আওয়াজই শুনতে পান না অভয়পদ সরকার। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায় যখন বাংলা দেশের আকাশ দিয়ে ছুটতে থাকে, তখন বজ্রপাতের আওয়াজ তিনি শুনতে পান। ভগবানের লীলা বোঝা মুশকিল। সেই জন্যেই তিনি আজও বুঝতে পারেন নি, কেন এবং কি পুণ্যের ফলে আজও এই ঘরখানার ওপর ছোটখাটো বজ্রের আঘাত এসে লাগে নি।

ভোরবেলা থেকে আজ তিনি সানাইয়ের সুর শুনতে পাচ্ছেন। বিয়ের সিজ্‌ন্‌ শুরু হয়েছে। শিক্ষিত বাঙালী একজন হেমিংওয়ে কিনলেন বলে দুঃখ করবার কি আছে? অশিক্ষিত লোকের অভাব কিছু নেই। বই তাঁর বিক্রি কিছু হবেই। শীতের মুখে একটা গরম কোট তাঁর কিনতে হবে। তারাপদ গেল-বছরেও সুতির কোট পরে কলেজ করেছে। ছোট ভাইটাকে যদি তিনি একটা রেডিমেড গরম কোটও কিনে দিতে না পারেন, তা হলে উপন্যাস লিখে লাভ হবে কি? বাংলার বাতাসে সানাইয়ের সুর ভাসলো বলে অভয়পদবাবু কেন যাবেন স্বপ্ন দেখতে?

তবু স্বপ্ন তাঁকে দেখতে হয়। ধরে রাখতে হয় আদর্শের বিক্ষত অস্তিত্বটাকে। ধরে রাখতে হয় বলেই স্থূলতাকে ছেড়ে

দিতে হল। অভয়পদবাবুর সহসা মনে হল, সানাইয়ের সুরটা যেন রাজা বসন্ত রায় রোডের দিক থেকে ভেসে আসছে। সুলতারা থাকে সেই রাস্তাটায়। কল্যাণ কাল বলছিল যে, ওরা নাকি নতুন বাড়িতে উঠে যাচ্ছে। ঠিকানাটা জেনে রাখলে ভালই হত।

সুলতাকে ভালবাসতেন অভয়পদবাবু। বিয়ে করবেন বলেই তিনি ওকে ভালবেসেছিলেন। উপন্যাসের প্লট তৈরি করবার জন্যে তিনি কল্যাণের বোনকে নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করেন নি। আজ পাঁচ বছর পরে তাঁর ভালবাসার রূপ গেছে বদলে। বদলাতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। যে-ঘর থেকে ছখানা উপন্যাস বেরিয়েছে, সে ঘরে তিনি সুলতাকে এনে রাখতে পারতেন না। লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি সুলতাকে বিয়ে করতে পারতেন। কল্যাণদের মত একটি ভদ্র পরিবারের মধ্যে তিনি অশান্তির বীজ বপন করে দিয়ে আসতে পারতেন অতি অনায়াসে। কিন্তু তা তিনি করেন নি। অভয়পদ সরকার শিল্পী, দুঃখ বহনের ধৈর্যশীল সাধনার মধ্যে রয়েছে তাঁর সাহিত্যের চরম প্রেরণা, রয়েছে তাঁর জীবনের বিমুগ্ধ প্রণতি। তিনি নিজে যা পারেন, সুলতা তা পারবে কেন? তবু সুলতাকে তিনি আজও ভালবাসেন। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না, শিল্পীও তেমনি বাঁচে না ভালবাসার ধর্ম ছাড়া। কিন্তু এ ভালবাসার ফ্রেমের মধ্যে সুলতার দেহটা আজ আর খুব স্পষ্ট নয়। বিয়ের প্রশ্ন পাগলের প্রশ্নের মত হাস্যকর বলে ভাবেন তিনি।

সানাইয়ের সুরটা ক্রমশই করুণ হয়ে উঠছিল। সুরের মধ্যে বিবাহের বিজ্ঞপ্তিটা যেন খুবই স্পষ্ট বলে মনে হল তাঁর। কান পেতে ভাল করে শুনতে লাগলেন অভয়পদ সরকার। কে যেন ডাকছে তাঁকে। সুলতা নয় তো ?

প্রথম বই বেরুবার পরে কল্যাণদের পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয় অভয়বাবুর। চা খেতে গিয়েছিলেন প্রথম সন্ধ্যায়। তারপরে গল্প করতে গেলেন সুলতার সঙ্গে। গল্প শেষ হওয়ার পরে শুরু হল ব্যক্তিগত সুখদুঃখের সংবাদ-বিনিময়। ওঁদের দেখা হতে লাগল রাজা বসন্ত রায় রোডের বাইরে বিভিন্ন ঠিকানায়। ভালবাসার শেষ সংবাদ বিনিময় হতে তিন বছর কাটল। ততদিনে অভয়বাবু তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছেন।

ফোর্ট উইলিয়ামের পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অভয়বাবু সুলতাকে বলেছিলেন, "আমার জন্যে অপেক্ষা করে লাভ নেই সুলতা।"

"কেন ? তোমার উপন্যাসের নায়িকারা তো অপেক্ষা করছে ?"

"কেন করছে জানি না, কিন্তু তুমি অপেক্ষা করবে কেন ? উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের টাকার দরকার হয় না। তোমার হবে। তুমি রিয়েল, নায়ক-নায়িকারা রিয়েল নয়"।

"তবে বই লেখ কেন ?" জিজ্ঞাসা করল সুলতা।

"বিয়ের সিজ্‌নে বিক্রি হবে বলে। বই আমি লিখি না, বই তৈরি করি। কেবল প্রথম বইখানাই আমার লেখা।"

শ্রাবণের গঙ্গা অনেকটা চওড়া দেখাচ্ছে। তার ওপরে জোয়ার এসেছে বলে জলের লেভেল উঁচু হয়ে উঠেছে অনেকটা। অভয়বাবু আর সুলতা এসে দাঁড়ালেন আউটরাম ঘাটের কিনারে। জলের দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সবচেয়ে প্রিয়জনকে যদি ডুবতে দেখ, তা হলে তুমি কি করবে ?"

"রক্ষা করব।"—জবাব দিল সুলতা।

"যদি সাঁতার না জান ? আশেপাশে যদি কাউকে দেখতে না পাও ?"

"আমি তবু ঝাঁপিয়ে পড়ব।"

"আমার নায়িকারাও ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাই ওরা বাস্তব চরিত্র নয়। কিন্তু তুমি ? তুমি তো রিয়েল সুলতা, তুমি কেন ঝাঁপ দিয়ে মরতে যাবে ?"

"তা হলে তুমি কি কোনদিনও সংসার করবে না ?"

"শিল্পীর সংসারকে বিশ্বাস করতে নেই। তাঁদের স্বপ্নের সংসারে সবই পাওয়া যায়, পাওয়া যায় না কেবল প্রোটিন। তোমাকে বাঁচতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের। তোমার বাবার অফিসের বেয়ারা যা পারে, আমি তা পারি না। সংগ্রাম করবার ধৈর্য আমাদের জন্মগত গুণ। সংসারের সবাই ধৈর্য হারাতে পারে, আমরা পারি না। পারি না এই জন্যে যে,

জগতের বৃহত্তম শিল্পের মধ্যে রয়েছে ধৈর্যের সাধনা। পৃথিবীটা গড়ে উঠতে কত কোটি বছর লেগেছে ?"

"হয়তো অনেক কোটি বছর।" শাড়ির আঁচলটা দাঁতের ফাঁক থেকে টেনে নিয়ে সুলতা বললে, "সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এত কোটি বছর পরেও বাবার অফিসের বেয়ারা যা পারে তুমি তা পার না। তোমার দোষ নেই, ধৈর্য আছে। কিন্তু দেশটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার জন্যে কিছু একটা করা উচিত।"

"কি করবে ? রিভলিউশন ? সেও একদিনে আসবে না। যদি কখনও আসে, আমার আর বিয়ে করবার সময় থাকবে না। অতএব লাবণ্যের মত আমাকেও বলতে হচ্ছে :

গ্রহণ করেছ যত
ঋণী তত করেছ আমায়
হে বন্ধু বিদায়—

রাত হয়ে গেছে। তোমার বাবা হয়তো ভাবছেন। রাজা বসন্ত রায় রোডের দক্ষিণ-খোলা বাড়িগুলোতে যেন রিভলিউশন না আসে—সেই প্রার্থনা আমার ভেসে বেড়াক গঙ্গার হাওয়ায়। সুলতা, আমরা আজ এই রাস্তার মোড় থেকে দুজনে বিপরীত-মুখী বাসে চেপে বসব। তুমি যাবে বালিগঞ্জের দিকে, আমি যাব শ্যামবাজারের চৌরাস্তায়। কলেজে পড়তে যাচ্ছ বলে লুকিয়ে আমার সঙ্গে আর দেখা করবার দরকার নেই। কলকাতার ভিড়ের মধ্যে যদি হঠাৎ কখনও দেখা হয়ে যায়,

তা হলে তোমায় চিনি না বলে আমি মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যাব না। সুলতা, তোমার সঙ্গে যেন আমার পরবর্তী সাক্ষাৎ ঘটে প্রকাশ্য দিবালোকে, এবং তা যদি শ্যামবাজারের চৌরাস্তায় ঘটে তো সোনায় সোহাগা। যে-প্রেম পিতামাতার সামনে ব্যক্ত করা যায় না, তা যদি প্রজাপতির শিরে চেপে রাজা বসন্ত রায়ের এলাকা অতিক্রম করে, আমি তাও সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে পারব না। প্রোটিনের অভাবটাই আমার চরমতম ট্রাজেডি নয়। তিনখানা প্রথম-শ্রেণীর উপন্যাস লেখবার পরেও বাংলা দেশেব কোন পিতাই আমায় জামাই বলে গ্রহণ করলেন না। তোমার বাবার অফিসের বেয়ারা যা পারে আমি তা পারি নে। সে তাব শ্বশুরের পায়ের ধুলো নিতে পারে, অথচ আমার জীবনে তেমন সুযোগ এল না। অতঃপব আধ ডজন প্রকাশকের বারোটি পায়ের তলায় মাথা গুঁজে রয়েলটি গণনা কবা ছাড়া আমার আর কাজ নেই। এর চেয়ে বড় রিভলিউশনের কথা তুমি ভাবতে পার সুলতা ?"

না, সুলতার পক্ষে ভাবা অসম্ভব। সুলতার বাবা কিংবা ডক্টর উপাধিওয়ালা দাদা কল্যাণ মিত্রও ভাবতে পারেন নি। বাংলার শিক্ষিত সমাজের কেউ পারেন না ভাবতে।

তার পরে আরও দুটো বছর কেটে গেছে। সানাইয়ের সুর তিনি প্রতি বছরই শোনেন। কিন্তু আজকের সুর শুনে ঔপন্যাসিক অভয়পদ সরকার বড্ড বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। এ সুরের

মধ্যে তিনি নতুন ভাষা শুনতে পাচ্ছেন। বিয়ের সিজন্ শুরু হওয়ায় বই বিক্রি তাঁর বাড়বে। কিন্তু তাতে এতটা চঞ্চল হয়ে ওঠার কোন কারণ ছিল না। কাল কিংবা পরশু প্রকাশকের কাছ থেকে কিছু টাকা তিনি পাবেন। তা দিয়ে তারাপদর জন্যে একটা রেডিমেড গরম কোট কেনবার ব্যবস্থাও করে রেখেছেন অভয়বাবু। তবে ?

বিছানায় শুয়েই তিনি দেখতে পেলেন, মেঝের ওপর একখানা চিঠি পড়ে রয়েছে। কাল বিকেলে বোধ হয় দরজার ফাঁক দিয়ে পোস্টম্যান চিঠিখানা ফেলে দিয়ে গেছে। অভয়বাবু চিঠিখানা খুলে ফেললেন। তাঁরই বাল্যবন্ধু নীরেন বসুর চিঠি। তারিখ দেখে বুঝলেন, চিঠিখানা চাব দিন আগের। এ কদিন চিঠিখানা তাঁর নজরে পড়ে নি। চিঠিতে বিশেষ কিছু লেখা ছিল না। বন্ধু তাঁর জানিয়েছেন যে, দিল্লী থেকে তিনি কলকাতায় পৌছবেন দু-তিন দিনের মধ্যেই।

বিছানায় শুয়েই অভয়বাবু অনুমান করলেন, বেলা হয়েছে। কসবার আকাশ পেরিয়ে সূর্য বোধ হয় এতক্ষণে উঠে এসেছে বালিগঞ্জ রেলস্টেশনের মাথার ওপরে। সানাই বাজানো বন্ধ হল।

দশ বছর পেছনে ফিরে গেলেন তিনি। নীরেন বসু আর অভয় সরকার বি, এ পাস করলেন। নীরেন বসু ছেলেবেলা থেকেই প্রথম হয়ে পরীক্ষাগুলো সব পাস করে এসেছেন। অভয়বাবু পাস করলেন সাধারণভাবে। একদিন সন্ধ্যেবেলা দুই

বন্ধুতে এসে বসলেন লেকের ধারে। বর্তমান নিয়ে আলোচনা হল না। ভবিষ্যতের কথাই ভাবছিলেন ওঁরা।

অভয়বাবু বললেন, "কষ্ট পাব জানি, কিন্তু সাহিত্যের বাইরে জীবিকার সন্ধান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তোর ভাবনার কোন কারণ নেই নীরেন, তোর মত ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে বাংলা দেশে কটা আছে? বড় চাকরি তুই পাবিই।"

"তা পাব। দিল্লীতে ইণ্টারভিউ পেয়েছি। চাকরি পাওয়ার পরে তোকেও আমি সেখানে নিয়ে যাব অভয়। না না, কোন আপত্তি আমি শুনব না। সব সাহিত্যিকই তো চাকরি করেন।" শেষের কথাটা নীরেন বসু বেশ জোর দিয়েই বললেন।

"না, আমাব পক্ষে তা আর সম্ভব নয়। গোটা অস্তিত্বটাকে যদি সাহিত্যেব মধ্যে ডুবিযে দিতে না পাবি, তা হলে সাধনায় সিদ্ধি আসবে কেন? আদর্শেব পায়ে আত্মসমর্পণ একেবারে শর্তহীন হওয়া চাই নীরেন। কষ্টের কথা বলছিস? কষ্ট ছাড়া শিল্পীর তো সত্যদর্শন হয় না। আজকেব এই মানব-সভ্যতায় আদর্শের কোন স্থান নেই জানি, তবু বলব—পৃথিবীতে যদি দু-চারজন লোকও আদর্শের মর্যাদা বাঁচিয়ে রাখতে না পাবেন, তা হলে ডার্ক এজেব সঙ্গে এ যুগেব পার্থক্য বইল কি? দিল্লীতে গিয়ে চিঠি দিস, তুই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। দিল্লী-কলকাতার দূরত্ব যেন আমাদের আত্মীয়তাকে ভাঙতে না পারে।"

"তা হলে আমার একটা কথা রাখ্ অভয়। রাখবি তো?"

"বল্।"

"আমি যদি তোকে কোনদিন সাহায্য করতে চাই, ফিরিয়ে দিস না।"

"দেব না, যদি সাহায্যের দরকার হয়।"

নীরেন বসু দিল্লীতে চাকরি পেয়েছেন আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে। বড় চাকরি। দুই বন্ধুর মধ্যে যোগাযোগ কখনও ছিন্ন হয় নি। চিঠিপত্রের আদান-প্রদান অব্যাহত রয়েছে দশ বছর ধরেই। কলকাতায় এসে নীরেন বসু অভয়-বাবুর সঙ্গে দেখাও করে গেছেন কয়েকবার। সাহিত্যক্ষেত্রে যে অভয় সরকারের নাম হয়েছে, তার সব খবরই তিনি রাখেন। দিল্লীর ঘোষ কোম্পানির বইয়ের দোকান থেকে নীরেন বসু অভয়পদ সরকারের বিখ্যাত উপন্যাসগুলো কিনে কিনে বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের বিয়েতে উপহারও দিয়েছেন। বই কিনে উপহার দেওয়া ছাড়া তিনি বন্ধুকে আর কোন রকমেই সাহায্য করতে পারেন নি। অভয়পদ সরকারের জন্মদিন উপলক্ষে তিনি কৌশল করে প্রতি বছরই পাঁচ শো টাকার মনি-অর্ডার পাঠাতেন। ঔপন্যাসিক অভয়বাবু তা কখনও গ্রহণ করেন নি। মনি-অর্ডার ফেরত পাঠিয়ে দিতেন।

তিন দিন আগের চিঠিখানা বিছানায় শুয়েই অভয়বাবু দ্বিতীয়বার পাঠ করলেন। কি ব্যাপার? নীরেন আবার

কলকাতায় আসছে কেন? প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের ঘরখানার দারিদ্র্য পর্যবেক্ষণ করতে নাকি? অনেক রকমের প্রশ্ন তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল। হাসি এল অভয়-বাবুর। তিনি ভাবলেন, নীরেন কেবল তাঁর ঘরের দারিদ্র্যই দেখে যাবে, মনের ঐশ্বর্য তাঁর সে দেখতে পাবে না। এবার হয়তো সে একসঙ্গে পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। সাহায্য করবার জন্যে নীরেনটা এবার পাগলামি করবে নিশ্চয়ই।

এম,-এ, পি-এইচ, ডি, বাড়িওয়ালার একতলার পেছনের ঘর থেকে দিনের আলো এক রকম দেখাই যায় না। দুপুরবেলা মনে হয় সন্ধ্যে হতে আর দেরি নেই। অভয়পদবাবু তাঁর ঘরের একমাত্র দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনুমান করলেন, বেলা বোধ হয় এগারোটার কম নয়। অগ্রহায়ণ মাসের সূর্য এতক্ষণে গড়িয়াহাটা বাজার অতিক্রম করেছে নিশ্চয়ই। দেশ-প্রিয় পার্কের মাথার ওপরে সূর্য এলে, তিনি জানেন বারোটা বাজবে। পার্কের পশ্চিম দিকের গলিটার মধ্যে মাদ্রাজীদের গোটা তিনেক হোটেল আছে। অভয়বাবু পার্কের দিকে মুখ করে এরই একটা হোটেলে বসে চার আনায় মধ্যাহ্ন-আহার শেষ করেন। আজ একটু তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে পড়লেই ভাল হয়। নীরেন হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বে।

ঘরের বাইরে এসে তিনি দরজাটা ভাল করে বন্ধ করলেন। তালাটা টেনে দেখলেন, ঠিকমত লাগল কিনা। ঘরের দরজা

খোলা পেলে নীরেন হয়তো পাঁচ হাজার টাকার চেকখানা বিছানার তলায় লুকিয়ে রেখে যাবে। রাত দশটার আগে আজ আর তিনি রাজপুত্র গোলাম মহম্মদের ক্রোড়ে ফিরে আসবেন না বলে মনস্থ করলেন। প্রকাশকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটা রেডিমেড কোট কিনে তিনি যাবেন তারাপদর হস্টেলে। কাল ভোরে কলেজে যাবার সময় ছোট ভাইটা গরম কোট পরতে পারবে।

গলিটার মোড়ে এসে ট্যাক্সি দাঁড়াল। ট্যাক্সি থেকে নেমে এলেন নীরেন বসু। পেছন দিকে রাস্তা আছে মনে করে অভয়পদ সরকার সরে পড়তে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পেছন দিকে রাস্তা কই ? কলতলা। একতলার গুটি কয়েক ভাড়াটিয়াদের জন্যে সেখানে একটা চৌবাচ্চা তৈরি করিয়েছেন এম, এ, পি, এইচ, ডি ভদ্রলোক। ভাড়া দেবেন বলে তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেব বাড়ির প্ল্যান তৈরি করেন নি। অভয়বাবু পেছন দিকে ছুটতে গিয়ে চার ফুট উঁচু চৌবাচ্চার সঙ্গে ধাক্কা খেলেন।

"কি রে, কোথা যাচ্ছিস ?" জিজ্ঞাসা করলেন নীরেনবাবু।

"এদিকে তো রাস্তা নেই, যাব আর কোথায় ? ভাবছিলুম চান করব। তার পর, হঠাৎ কলকাতায় ?"—হাসবার চেষ্টা করলেন অভয়পদ সরকার।

"দাদা গাড়িতে বসে আছেন। আমার চিঠি পাস নি ?"

"পেয়েছি।"

"আজ আমার বিয়ে অভয়। দাদার বাড়ি থেকে রওনা

হব সন্ধ্যে সাড়ে ছটায়। তুই আসবি বেলা চারটেতে। হ্যাঁরে, দাদা তোকে বিয়ের চিঠি পাঠিয়েছেন, পাস নি?"

"কই, না তো!"

"পোস্টে পাঠিয়েছেন, বিকেলের ডাকেই হয়তো এসে পৌঁছবে।"

"বিয়ের চিঠি না পেলেও তোর বিয়েতে যাব।"

"অনেক কাজ এখনও বাকি রয়েছে। দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হল। এখন চলি। তোর সঙ্গে আমাব অনেক কথা আছে। হ্যাঁরে অভয়, মাথার চুল যে তোর সব পেকে গেল! ছি ছি, একি চেহারা হয়েছে তোর? জানি, আমার সাহায্য তুই নিবি না। তবুও তোর জন্যে আমি পাঁচ হাজার টাকা আলাদা করে রেখেছি। অভয়, মা তোর জন্যে একখানা ধুতি আর একটা পাঞ্জাবি পাঠিয়েছেন। সন্ধ্যেব সময় পরে আসিস। চললুম।" নীরেন বসু অভয়বাবুর হাতে একটা কাগজের প্যাকেট গুঁজে দিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে বসলেন।

বেলা চারটের সময় অভয় সরকারের ঘরে রাত বারোটা'র মত অন্ধকার নেমে আসবার কথা। আজ যেন কোথা দিয়ে খানিকটা আলো এসে ঢুকে পড়েছে ঘরে। শান্তিপুরের তাঁতের ধুতিখানা পরতে তাঁর ভাল লাগছিল। সিল্কের পাঞ্জাবিটা গায়ে দেবার পরে অভয়বাবুব মনে হল, ঘরের অন্ধকার যেন সবই কেটে গেছে। কোটি কোটি যক্ষ্মা-বীজাণু আলোর আক্রমণ সহ্য করতে পারছে না। আবদ্ধ ঘরখানাতে রিভলিউশন এসেছে।

খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে পিওন একটা চিঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল। নীরেনের বিয়ের চিঠি। চিঠিখানা খুললেন তিনি। চিঠিখানা হাতে নিয়ে অভয়বাবু রোমাঞ্চ অনুভব করলেন। একবারে চিঠিখানা পড়তে ভাল লাগবে না তাঁর। ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ তিনি পড়বেন। বিনা খরচায় বিলম্বিত রোমাঞ্চের স্বাদ গ্রহণ করবেন তিনি। বহু বছর হয়ে গেছে কারো কাছ থেকেই তিনি বিয়ের চিঠি পান নি। নীরেনের বিয়ের চিঠিখানা হাতে নিয়ে অভয়বাবু কোন এক অজ্ঞাত আনন্দের উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলেন। পরনে শান্তিপুরের ধুতি, গায়ে জাপানী সিল্কের পাঞ্জাবি! দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক অভয়পদ সরকার।

চারটে বেজে গেছে নিশ্চয়ই। নীরেনের কাছে চারটের মধ্যে গিয়ে পৌঁছবার কথা। চিঠিখানা এবার পড়ে ফেলা যাক। পড়তে পড়তে অভয়বাবু পাথরের মত শক্ত হয়ে গেলেন। সিল্কের পাঞ্জাবিটা যেন গণ্ডারের চামড়ার মত খসখসে হয়ে উঠল। তাঁর উপন্যাসের নায়িকারা প্রেমাস্পদের জন্যে অপেক্ষা করেন, কিন্তু সুলতা আর অপেক্ষা করে নি। নীরেনের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে।

নীরেনদের বাড়িতে যাওয়ার আর তাড়া নেই। তিনি এসে বসে পড়লেন চৌকির ওপর। ভাবতে লাগলেন বসে বসে। কিন্তু ভাবনার এতে কি আছে? আর কতদিন সুলতা অপেক্ষা করবে? প্রকারান্তরে সুলতাকে অপেক্ষা করাবার জন্যেই কি

তিনি তাঁর লেটেস্ট উপন্যাসের নায়িকাদের অপেক্ষা করিয়ে রাখেন নি? সুলতা রিয়েল, তাই সে আজ অভয়বাবুকে যোগ্য উত্তর দিয়েছে। এবার তিনি তাঁর কাল্পনিক ভালবাসার ধর্ম পালন করতে পারবেন জীবনের বাকি কটা দিন। সুলতা জিতেছে। হেরে গেছে অভয়বাবুর উপন্যাসের নায়িকারা।

একটু পরে তিনি স্বাভাবিক হয়ে এলেন। পাথরের মত শক্ত দেহটা নরম হয়ে এল। এবার তিনি ভাবলেন, সুলতা ঠিকই করেছে। অপেক্ষা করে মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। নিজে ডুবেছেন বলে সুলতাকেও তিনি ডুবতে সাহায্য করছিলেন কেন? অভয়পদবাবু ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন এই বলে যে, তিনি সুলতার মনে সৎ বুদ্ধি দিয়েছেন। সুলতা আর নীরেন যেন সুখী হয়। জীবনে তিনি আজ প্রথম নীরেনের সাহায্য গ্রহণ করলেন। এত বড় সাহায্যের কাছে পাঁচ হাজার টাকার মূল্য বোধ হয় কানাকড়িও নয়।

কখন যে সূর্য অস্ত গেছে অভয়বাবু তার খবর রাখলেন না। প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের কোথাও আর এক বিন্দু আলো নেই। সন্ধ্যে পার হয়ে রাতের শুরু হল। অভয়বাবু এবার রওনা হবেন। নীরেন এতক্ষণে বিয়ে-বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। চিঠিখানা থেকে তিনি সুলতাদের নতুন ঠিকানাটা দেখে নিলেন। নিউ আলিপুর যেতে হবে। নীরেনের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। সুলতাকে বিয়ে করে সে সত্যিকারের

বন্ধুত্ব দেখিয়েছে। নীরেনের সাহায্য তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে রাখবেন।

মনে রাখবার সুবিধে পেলেন না অভয়পদ সরকার। ট্যাক্সি থেকে নেমে এল সুলতা। গায়ে গহনা, পরনে বেনারসী শাড়ি, চোখে জল। মানব সভ্যতার প্রথম প্রভাতে যে-নারী তার প্রেমাস্পদকে লুকিয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তার সঙ্গে সুলতারও কোন পার্থক্য নেই। শিল্পী অভয়পদ সরকার সুলতাকে চিনে ফেললেন এক মুহূর্তে।

সুলতা বললে, "বাবা এবং দাদাকে আজ জানিয়ে এসেছি। জেনেছেন নীরেনবাবুও। চল—"

"কোথায় ?" জিজ্ঞাসা করলেন অভয়বাবু।

"নিউ আলিপুর।" চোখের জল মুছে জবাব দিল সুলতা।

দ্বিতীয় ট্যাক্সি এল। কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে এলেন নীরেন বসুও। কেউ কোন কথা বলবার আগে, বাংলা দেশের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক অভয়পদ সরকার বললেন, "তোর সাহায্যের কথা আমি চিরকাল মনে রাখব নীরেন।"

সুকুমারীর জ্বর এল সকাল সাড়ে আট-টায়। ছোটভাই নন্তু ছুটতে ছুটতে চলে এল মায়ের কাছে। বারান্দার এক কোণায় তোলা উনোনে রান্না চাপিয়েছেন মা। নন্তু বলল, "দিদির জ্বর এসেছে। দিদি আজ ভাত খেতে পাবে না।"

মায়ের কানে খবরটা তুলে দিয়ে নন্তু গিয়ে হাজির হল বাবার কাছে। নন্তুর বাবা সরোজ ঘোষ চান করে এসে সবেমাত্র ঘরে ঢুকেছেন। ন'টার সময় অফিসে বেরুতে হবে। বালিগঞ্জ পোস্ট-অফিসে কাজ করেন তিনি। কেরানী। পোস্ট-অফিসের সব রকম কাজই তিনি জানেন। গত এক মাস থেকে মণি-অর্ডার নেওয়ার কাউণ্টারে তাঁকে বসতে হচ্ছে। টাকা গুণতে হয়, রসিদ লিখতে হয়। অফিস ছুটি হওয়ার আগে রসিদের সঙ্গে টাকার অঙ্ক মিলিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরতে তাঁর রাত আট-টা বেজে যায়। গত এক মাস থেকে তাই তিনি নিজের সংসারের দিকে ভাল করে নজর দিতে পারেন নি। পরের টাকার প্রতি বেশি করে মনোযোগ দিতে হচ্ছে। পরের টাকা গুণে গুণে সিন্দুকে সাজিয়ে রাখবার কাজেই দায়িত্ব থাকে সব চেয়ে বেশি। সেই জন্যেই বোধ হয় সরোজবাবু এতক্ষণ নন্তুকে দেখতে পান নি। দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাট-বাড়িটায় ফিরে এসেও চেয়ে থাকেন বালিগঞ্জ পোস্ট-অফিসের সেই সিন্দুকটার

দিকে। মনে মনে হিসেব করে মোট অঙ্কটা স্মরণ করেন বার বার।

বালিশের তলা থেকে ধুতি বার করলেন সরোজবাবু। অফিসে পরে যাওয়ার ধুতিখানা প্রতি রাত্রেই নতুন করে ইস্ত্রি হয় বালিশের চাপে। ভাঁজের দাগ স্পষ্ট না হলে নন্তু গিয়ে মাঝে মাঝে বালিশের ওপর চেপে বসে। ঘরের মধ্যে নন্তুকে দেখতে পেয়ে সরোজবাবু এবার বললেন, "থাক, আজ আর তোকে বসতে হবে না।"

"কেন বাবা? ভাল ইস্ত্রি হয় নি তো?"

"থাক, থাক, দরকার নেই। বালিশের তুলো বেরিয়ে গেছে। তাছাড়া গুণব তো পরের টাকা, অত বাবুগিরির দরকার কি?"

"বাবা, দিদির গা গরম হয়েছে। জ্বর এখন নিরেনব্বই। দিদি আজ ভাত খাবে না। বেশি ভাতটুকু আমি খেয়ে ফেলব, বাবা?"

কোমরে গিঁট বাঁধলেন সরোজ ঘোষ। মেয়েটার আবার জ্বর এল কেন? এক মাস পরেই তো সুকুমারীর বিয়ে। তিনি হিসেব করে রেখেছিলেন, তিন হাজার তেত্রিশ টাকা বারো আনা খরচ পড়বে বাসি বিয়ের দিন পর্যন্ত। বাসি বিয়ের দিন রাত্রে সুকুমারী শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে! তারপর আবার নতুন করে টাকা জমাবেন তিনি। নন্তুকে মানুষ করতে হবে। কিন্তু নন্তুই তো এখন আবার সর্বনেশে খবর নিয়ে এল। তিন

হাজার তেত্রিশ টাকা বারো আনায় সুকুমারীকে বোধ হয় পার করা যাবে না। ডাক্তার আর ওষুধের জন্যে বাড়তি খরচ পড়বে। হিসেবের মোট অঙ্কটা যেন ইতিমধ্যেই ভারি হয়ে উঠেছে। তিনি বেরিয়ে এলেন ঘরের বাইরে।

খবর শুনে নন্তর মা শৈলবালাও রান্না ফেলে উঠে এলেন। হাঁড়িতে ভাত ফুটছিল। অফিসে বেরুতে আজ বোধহয় নন্তর বাবার দেরি হবে। তা হোক, পুরুষমানুষকে টাকা রোজগার করতে হয় বলে অফিসটা সংসারের চেয়ে বড় নয়।

বড় ঘরখানাতেই প্রায় গোটা সংসারটা পাতা আছে। জোড়া তক্তোপোশের ওপর ঢালা বিছানা। দিনরাত পাতাই থাকে। যার যখন ইচ্ছে হয় ওখানেই শুয়ে পড়ে। সুস্থ এবং অসুস্থ দেহের জন্যে ঐ একই শয্যা। শুধু সরোজবাবুর জন্যে আলাদা ঘর। পুরো নয়, আধখানা। চানঘর করবেন বলে বাড়িওয়ালা এটা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হল না। দুঘরের ফ্ল্যাট নাম দিয়ে তিনি ভাড়ার অঙ্ক বাড়িয়ে দিলেন। সারা জীবন সরকারি কাজ করতে করতে সরোজবাবু শুকিয়ে গেছেন বলে ঘরখানাতে রাত কাটাতে তাঁর স্থানের অভাব হয় না। ঘুমের মধ্যে হাত-পা ছোঁড়ার অভ্যাসও তাঁর নেই। থাকলে দেয়াল দুটোর পলস্তারা খসে পড়ত অনেক দিন আগেই।

শৈলবালা পৌঁছে গিয়েছিলেন। থারমোমিটার দিয়ে সুকুমারী দ্বিতীয়বার জ্বর মাপছিল। মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কত উঠল?"

"নিরেনব্বই।" জবাব দিল স্নকুমারী।

"কমে নি?"

"এই তো হল, এক্ষুনি কমবে কি করে মা?"

সরোজবাবু বললেন, "নিরেনব্বই থেকে কমলে তো আর জ্বরই থাকে না। এখন কি করবে বল?"

"সুধা-ডাক্তারকে ডাকো। বোস-গিন্নী খবর পেলে অসুস্থ বৌকে ঘরে তুলতে চাইবেন না।"

বোস-গিন্নীর ছেলে নিত্যবন্ধুর সঙ্গে স্নকুমারীর বিয়ে পাকা হয়ে আছে। বোস-গিন্নী হচ্ছেন শৈলবালার সই। দীনবন্ধু বসুও পোস্ট-অফিসে কাজ করেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগে সরোজবাবু আর দীনবন্ধুবাবু বরিশালের বড় পোস্ট-অফিসে একসঙ্গে কাজ করতেন। দুই পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। স্নকুমারী আর নিত্যবন্ধুর বয়স তখন খুবই কম ছিল। কোন রকম ভাবের আদান-প্রদানের পথ তৈরি হওয়ার আগেই দীনবন্ধুবাবু বদলি হয়ে চলে এলেন ঢাকা শহরে। তারপর স্বাধীন ভারতবর্ষে দুই পরিবারের মধ্যে আবার দেখা হয়। এর মধ্যে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে। স্নকুমারী স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা পাশ করেছে গেল বছর। নিত্যবন্ধুও বেশিদূর লেখা-পড়া করে নি। চাকরি করে। স্থায়ী কাজ। মাগ্‌গী ভাতা নিয়ে মাসিক মাইনে একশো পঞ্চাশ। এ বাড়িতে তার খুব আসা-যাওয়া নেই। স্নকুমারীর সঙ্গে পরিচয় ওর খুব সামান্যই। এ বিয়েতে সরোজবাবু মত দিয়েছেন বটে,

তবে মত দেওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল না। সুকুমারীকে তিনি পড়াতে চেয়েছিলেন। লেখাপড়ায় ভাল মাথা ছিল ওর। বি, এ পরীক্ষাটা পাশ করতে পারলে নিত্যবন্ধুর চেয়ে বেশি মাইনের চাকরি পেত সে। তা ছাড়া নিত্যবন্ধুব একশো পঞ্চাশ টাকার হিসেবটা তো সরোজবাবুর মুখস্থই আছে। নিত্যবন্ধু পান খায়, সিগারেট খায়, সিনেমা দেখে, সিনেমার কাগজ কেনে, সাধারণ এবং পূজা সংখ্যা হুটোই কেনে। তারপর? সংসারে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিতে হয়। সব দিয়ে-থুয়ে নিত্যবন্ধুর হাতে বাড়তি টাকা কিছু না থাকারই কথা। বি, এ পাশ করে সুকুও যদি চাকরি করত তা হলে হুজনের উপার্জনে হুঘরের একটা ফ্ল্যাট বোধহয় ভালই চলতো। সংসার চালাবার চেয়ে আজকাল কি ফ্ল্যাট চালানো বেশি কঠিন নয়? নিত্যবন্ধুর সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি বিয়েটা ঠিক করে ফেলা শৈলবালার উচিত হয় নি। এই বাড়িতে না কি সে পাপ ঢুকতে দেখেছে! ঘর তো মাত্র দেড়খানা, একটা আলনা রাখবার মত একটু জায়গা পর্যন্ত নেই—অথচ শৈলর বিশ্বাস, সুকুমারীর আশেপাশে পাপের বাসা তৈরি হচ্ছে! এ-বাড়িতে আসেই বা কে, আসে শুধু দিলীপ। তাও সে প্রায় হুমাস থেকে আর আসে না। শৈল তাকে আসতে বারণ করে দিয়েছে। ছেলেটার বাপ-মা নেই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সময় দিলীপ সরকারদের গোটা পরিবারটাই খতম হয়ে গিয়েছিল বরিশালের দাঙ্গায়। দিলীপ কিন্তু বুদ্ধিমান ছেলে। মাথায় একটা

তুর্কী টুপী পরে দেয়াল টপ্কে পালিয়ে গিয়েছিল বলে স্বাধীনতার মূল্য ওকে দিতে হয় নি। তারপর ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে কেমন করে কোন্ পথে যে কলকাতায় এসে পৌঁছল সে কাহিনী সরোজ ঘোষের জানা নেই। দিলীপ মেডিকেল কলেজে পড়ে বলেই তিনি শুনেছেন। ওদের পরিবারের সঙ্গেও সরোজবাবুর পরিচয় ছিল। সুকু দিলীপকে চিনতো বরিশালে থাকতেই।

সুকুমারীর গায়ে হাত দিয়ে শৈলবালা বললেন, "নিরেনব্বই বলে তো মনে হচ্ছে না। গা তো ঠাণ্ডা। তা যাক বাপু, সুধা-ডাক্তারকে একবার ডাকো।"

তিন হাজার তেত্রিশ টাকা বারো আনার হিসেবটা স্মরণ করে সরোজবাবু বললেন, "জ্বর তো মাত্র নিরেনব্বই, এক্ষুনি কি দরকার আট টাকা ভিজিট দিয়ে ডাক্তার ডাকবার যা করবার ও-বেলায় করা যাবে।"

"না, না, অসুখ বিসুখ নিয়ে খেলা করবার সময় নেই—" একটু চুপ করে থেকে শৈলবালাই বললেন, "ঠিক আর ত্রিশটা দিন আছে। তা ছাড়া সময়টা এখন ভাল না। চারদিকে নাকি বসন্ত হচ্ছে।"

"তা হলে—" সরোজবাবু সুকুমারীর দিকে চেয়ে বললেন, "আমার ঘরটা তো খালি পড়ে আছে, সুকু বরং ওখানে গিয়েই থাকুক। শরীর অসুস্থ হলে মানুষ একটু আরাম চায়। এখানে নন্তু ওকে ঘুমুতে দেবে না। বিরক্ত করবে। আয়,

উঠে আয় সুকু। আমায় তো এবার অফিসে বেরুতে হবে। ন'টা তো বাজলই। নন্তুটা গেল কোথায় ?”

“এই যে বাবা আমি।”

“দিদির বালিশটা নিয়ে আয়। থারমোমিটারটা তুই নিজের হাতে রাখ, সুকু।”

নিজের ঘরে সুকুমারীকে শুইয়ে দিয়ে সরোজবাবু খেতে বসলেন।

সুকুমারীর ঘুম এল না। মনটা ওর খুশিতে ভরে উঠেছে। জ্যোৎস্না রাত্রির চেয়েও দুপুরটা ওর ভাল লাগছে আজ। ঘরখানা যত ছোটই হোক, সবার থেকে আলাদা হয়ে এমন স্বাধীনভাবে শুয়ে থাকবার মত জায়গা জীবনে সে এই প্রথম পেল। এ পাওয়া যে কত বড় পাওয়া মা বোধহয় সারা জীবনেও তা বুঝতে পারবেন না। উনিশ বছর বয়সের প্রতিটি মুহূর্তই লেপ্টে ছিল গোটা সংসারটার সঙ্গে। সহজভাবে শুতে গিয়েও সতর্ক থাকতে হয়েছে।

মা আর নন্তু যেন পাহারাওয়ালার মত চেয়ে থাকে ওর দিকে। ঘরের আলো নিবিয়ে দিলেও বিছানার ওপর এক ইঞ্চি আড়াল পায় না সুকুমারী। অন্ধকার ঘরে, মা আর নন্তুর মাঝখানে শুয়ে দিলীপদার কথা ভাবতে গেলেও ভয় আসে মনে। মা বোধ হয় সব দেখতে পাচ্ছেন, শুনতেও পাচ্ছেন সব। মনের রাজ্যেও যেন এক ইঞ্চি আড়াল পায় নি সুকুমারী।

দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটে স্থানের অভাবটা যে কত বড় অভাব, দিলীপদাকে ভাল না বাসলে ও তা জানতেই পারত না। একটু নিরিবিলিতে বসে তার সঙ্গে গল্প করবার সুযোগ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ইশারা ইঙ্গিত দিয়ে ভালবাসার পথ তৈরি করতে হয়েছে ওকে। নন্তুও বুঝতে পেরেছে যে, দিলীপদার প্রতি মায়ের মন খুবই বিরূপ। বাবা, মা, ভাই, বোন কেউ নেই বলে মায়ের বিশ্বাস দিলীপদার সাংসারিক মূল্য কানাকড়িও নয়। পারিবারিক পরিচয় একটা না থাকলে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয় কি করে? মায়ের কী অদ্ভুত রকমের যুক্তি! বাংলা দেশকে কেটে যারা দুটুকরো করল তাদের যেমন দিলীপদা রুখতে পারে নি, তেমনি দাঙ্গার সময় যারা তার গোটা পরিবারটাকে কেটে ফেলল তাদেরও সে ঠেকাতে পারে নি।

নিজের কপালের ওপর হাত রাখল সুকুমারী। জ্বর বাড়ল না কি? বিয়ের দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবে কি না সে সম্বন্ধে ওর মনে সন্দেহ জেগেছে। আজ তো মাত্র নিরেনব্বই। প্রত্যেক দিন যদি আধ ডিগ্রী করে জ্বর বাড়ে, তা হলেই ত্রিশ দিনের মধ্যে সমস্যা সব মিটবে। সমস্যা যেন এরই মধ্যে সব মিটে গেছে এমন মনে করে সে পাশ ফিরে শুল।

জানলার ফাঁক দিয়ে একটা নিম গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে। মৃদু হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো নড়ছে তাও দেখতে

পেল সুকুমারী। বাবার ঘরখানাতে যে একটা জানলা আছে তা যেন সে জানত না। খুবই ছোট জানলা। তা হোক জানলা তো বটে। বিছানায় শুয়ে কেবল গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে না, দুহাত চওড়া আকাশও দেখা যাচ্ছে। সুকুমারীর জগতে এযাবৎকাল গাছ-পাতা কিংবা আকাশ দেখবার সৌখিনতা ছিল না। বাবা যদি আজ ঘরখানা তাঁর ছেড়ে না দিতেন তা হলে এইটুকু সৌখিনতা করবার সুযোগ ওর জীবনে আসত কি ?

থারমোমিটার লাগাল সুকুমারী। জ্বরটা বোধ হয় বেড়েছে। দিলীপদাকে মনের কথাটা খুলে বলা হল না। বলবার জন্যে সে চেষ্টা কিছু কম করে নি। কিন্তু নিরিবিলি পেল কই ? দিলীপদা এলেই তো মা তাকে ডেকে নিয়ে যান বারান্দার সেই কোণটাতে। তোলা উনোনের পাশে মা তাকে বসিয়ে রাখেন। গত একটা বছরের মধ্যে মনের কথাটা তাকে বলবার জন্যে একটু আড়াল সে পেল না। ইশারা-ইঙ্গিতের সীমান্তে এসে থমকে দাঁড়িয়ে রইল সুকুমারী।

জ্বর বাড়ে নি, নিরেনব্বই। কালকে হয়তো বাড়বে। জ্বর না বাড়লে যেন সুকুমারী স্বস্তি পাচ্ছে না। রাগ হল থারমোমিটারের ওপর। পারদটুকুও কি মায়ের দলে গিয়ে ভিড়ে পড়েছে ? ইচ্ছা হল, তোলা উনোনের জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে ওদের চক্রান্ত সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে। দরকারের সময় জ্বরের মাত্রা পর্যন্ত বাড়তে চায় না।

তৃতীয় দিনেও উত্তাপ সেই নিরেনব্বই ডিগ্রী। সকালের দিকেই শৈলবালা বললেন, "আর অপেক্ষা করা চলে না। সুধা-ডাক্তারকেই ডাকো।"

সরোজবাবু বলবার চেষ্টা করলেন, "জ্বর তো মাত্র নিরেনব্বই। ঝপ্ করে আট টাকার ডাক্তার—"

"কি করতে চাও শুনি? সামনে শুভকাজ, মেয়ে কি তোমার নিরেনব্বই জ্বর নিয়ে বাসর-ঘরে ঢুকবে? বোস-গিন্নী তো এরই মধ্যে কত রকমের সন্দেহ করছেন। জিজ্ঞাসা করছেন, সন্ধ্যের দিকে জ্বর আসে না কি? ওজন খুব তাড়াতাড়ি কমে যাচ্ছে কি না। না, আজকেই ডাক্তার ডাকো।"

"ডাকব। ভাবছিলাম, জ্বর যখন এত অল্প, তখন দিলীপকে একবার খবর পাঠালে কেমন হয়।"

"দিলীপ?" উত্তেজনায় শৈলবালা বসে পড়লেন সুকুমারীর পাশে, "দিলীপ ডাক্তারীর কি জানে? মেডিকেল কলেজে পড়লেই বিদ্যে হয় না কি?"

"ডাক্তারীবিদ্যে মেডিকেল কলেজেই শিখতে হয়, শৈল।"

"শিক্ষা আগে শেষ হোক—"

এবার সুকুমারী সরোজবাবুর দিকে চেয়ে ঘোষণা করল, "দিলীপদা পাশ করেছে, বাবা।"

"তুই কি করে জানলি?" চেঁচিয়ে উঠলেন শৈলবালা, "তার এল কখন? চিঠি পেয়েছিস্ বুঝি?"

জবাব দিল সুকুমারী, “না। দুমাস আগেই আমি জানি।”

“তা হলে আমরা জানলুম না কেন?” গর্জন করে উঠলেন শৈলবালা, “আমাদের সে জানাল না কেন? বিনা তারে তোদের মধ্যে খবর চলছে বুঝি? টরে-টক্কার আওয়াজ শুনলুম কই?”

“সেদিন দিলীপদা সেই খবরটাই দিতে এসেছিল কিন্তু তার আগেই তো তুমি তাকে এখানে আসতে বারণ করে দিলে, মা।”

“বারণ করব না? তোর শাশুড়িই তো দিলীপের আসা-যাওয়া পছন্দ করেন না—”

সরোজবাবু বললেন, “থামো, শৈল। এত চেঁচামেচি করলে মেয়েটার আবার জ্বর বাড়বে। নিবেনব্বই থাকতে থাকতে দিলীপকে একবার ডেকে দেখাই। এতে আপত্তির কি থাকতে পারে? নতুন পাশ করেছে, ভিজিট পাওয়ার চেয়ে ওর বেশি দরকার রোগী পাওয়া। ও উপার্জন করবে অভিজ্ঞতা, আমাদেরও ব্যয় কিছু হবে না। অফিস থেকে ফেরবার মুখে দিলীপকে আমি ডেকে নিয়ে আসব। কইরে নন্তু, ইস্ত্রি কি তোর এখনো শেষ হল না?”

শৈলবালা কিছু বলবার আগে, বড় ঘর থেকে নন্তু বেরিয়ে এসে বলল, “তোমার বালিশে আর তুলো নেই বাবা। চেপে বসতে গিয়ে দেখি, ফাঁক দিয়ে তুলো সব বেরিয়ে পড়ছে।”

"ধুতিটা তবে কি করলি ?"

"মায়ের বালিশের তলায় রেখে এসেছি। তুমি খেয়ে নাও গে আগে—দেখবে, আজ কী চমৎকার ইস্ত্রি করে দিই।"

নন্তু চলে যাওয়ার পরে শৈলবালা ক্লান্ত স্বরে বললেন, "দিলীপ-ডাক্তারকে ডাকতে যাচ্ছ, ভাল করে সেজেগুজে যাও।"

সহসা সুকুমারী তার নিজের কপালের ওপর হাত রাখল। না, জ্বর এখনো বাড়ে নি। নিরেনব্বই-এর মাত্রা পেরিয়ে গেলে, হয়তো দিলীপ ডাক্তারকে দিয়ে আর কাজ হবে না।

সন্ধ্যের দিকে সরোজবাবু ফিরলেন দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসতেই শৈলবালা বারান্দার কোণা থেকে ডাকলেন, "এই যে দিলীপ, এদিকে একটু এস তো।"

সরোজবাবু বললেন, "তুমি একটু সুকুর মায়ের সঙ্গে কথা কও, আমি অফিসের কাপড়-চোপড় বদলে আসছি।"

ডেক্‌চিতে আলু সেদ্ধ হচ্ছিল। ডেক্‌চিটা নামিয়ে রেখে শৈলবালা দিলীপের মুখ থেকে পা পর্যন্ত ভাল করে দেখতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "হাতে ওটা কি তোমার বাছা ?"

"ব্যাগ।" জবাব দিল দিলীপ।

"ব্যাগ ? ওটা কিনলে কবে ? ওতে কি আছে ?"

"কিছু ওষুধ পত্তর আছে। ইন্‌জেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ—"

শৈলবালা খপ্ করে ব্যাগটা দিলীপের হাত থেকে টেনে নিয়ে বললেন, "আমি দেখব।"

ঘর থেকে সরোজবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, "ওতে দেখবার কিছু নেই, শৈল। এসো দিলীপ—" শৈলবালার হাত থেকে ব্যাগটা তিনি নিয়ে নিলেন।

ডাক্তারের জন্যে সুকুমারী আজ সারাটা দিন অপেক্ষা করেছে। দিন আর কাটতে চায় নি। এতক্ষণ পরে দিন শেষ হল। দিলীপদা এসেছে। এলেন সরোজবাবুও। শৈলবালা একটু বাদেই ঘরে ঢুকে বললেন, "দেখি, সরো দিকি—" হাতে করে তিনি একটা চেয়ার নিয়ে এলেন। চেয়ারের একটা পা অনেকদিন আগেই ভেঙে গিয়েছিল বলে এটা গিয়ে ঢুকে পড়েছিল শৈলবালার হেঁসেলে। মশলার টিন আর টুকিটাকি জিনিস সব এর ওপরে তিনি সাজিয়ে রাখতেন। এখন সেই চেয়ারটাই তিনি দেয়ালের সঙ্গে ঠেকিয়ে দিয়ে বললেন, "নাও বাছা, এখানে বসো। রোগীর বিছানার ওপর আবার বসে পড়ো না।" সহসা তাঁর দৃষ্টি পড়ল দিলীপের গলার দিকে। চোখের মণি দুটো ওপর দিকে ঠেলে তুলে দিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, "ওটা কি ঝুলিয়েছ গলায়?"

"স্টেথেস্কোপ। বুকে কিংবা পিঠে যদি সর্দি বসে, তা হলে এটা দিয়ে আমরা ধরে ফেলতে পারি।"

"না বাপু, সুকুর বুকে-পিঠে কোন কিছুই বসে নি। রবারের নলটা তোমার থাক।"

সরোজবাবু বললেন, "ওর আজ তিন দিন ধরে জ্বর। আর কি কি উপসর্গ আছে সব ওকে বল্ না সুকু। কাশি আছে. না কি? গা ব্যথা?"

"না বাবা, ওসব কিছু নেই।"

দিলীপ বলল, "দেখি, তোমার ডান হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দাও তো।"

সুকুমারীর নাড়ি পরীক্ষা করতে লাগল দিলীপ ডাক্তার।

শৈলবালা একটু ঝুঁকে বসলেন। দুটো হাতের সংযোগ স্থলে খুব সতর্কভাবে চেয়ে রইলেন তিনি। রাগে আর বিরক্তিতে তাঁর চোখ দুটো প্রথম থেকেই বিস্ফারিত হয়েছিল। দুতিন মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পরে তিনি সুকুমারীর হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে এসে বললেন, "মেয়েমানুষের নাড়ি ওখানে থাকে না। তা ছাড়া, নাড়ি টিপবার নাম করে—"সুকুমারীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে তিনিই আবার বললেন, "তোর লজ্জা করে না, সুকু? নিত্যবন্ধু দেখলে কি ভাববে বল্ তো? নাও ডাক্তার, এবার একটা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে দিয়ে যাও।" শৈলবালা বিছানা থেকে উঠলেন। তাঁর দিকে দৃষ্টি দিল না দিলীপ। সুকুমারীকে বলল, "দেখি, তোমার জিবটা একবার দেখি।"

জিব বার করতে দ্বিধা করছিল সে। সরোজবাবু বললেন, "নে মা, জিবটা বার কর। ডাক্তারের কাছে আবার লজ্জা কি?—কি মনে হচ্ছে তোমার, দিলীপ?"

"নাঃ, বিশেষ কিছু না। জিব পরিষ্কার। নাড়ির গতিও স্বাভাবিক। জ্বর বোধহয় এখন নেই। ওষুধ একটা দিয়ে যাচ্ছি। কালই সব সেরে যাবে।" প্রেসক্রিপশন লিখতে আরম্ভ করল ডাক্তার দিলীপ সরকার। সরোজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রকম দাম পড়বে? পেটেণ্ট ওষুধ না কি?"

"না। এ্যালকেলি মিকশ্চার একটা দিলুম। দুটাকা চার আনার মধ্যে ছ' দাগ ওষুধ পাওয়া যাবে। জিব পরিষ্কার, ভয়ের কোন কারণ নেই। কেমন থাকে কাল আমায় একবার খবর দেবেন।"

"খবর দেব কি হে? কাল তুমি নিজেই আসবে। কালও যদি জ্বর রেমিশন না হয়, তা হলে—" সরোজবাবু শৈলবালার দিকে চেয়ে কথাটা শেষ করলেন, "তা হলে সুকুমারীকে ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে। না শৈল, তোমার কোন আপত্তিই আমি শুনব না। বুকে-পিঠে সর্দি বসে গেলে সর্বনাশ হবে। দুপেয়ালা চা দাও দিকি, শৈল। দিলীপ, যাওয়ার আগে সুকুর পথ্যের ব্যবস্থা করে দিয়ে যেও।"

"চা আর পাতলা টোস্ট খেতে পারে। বার্লির সঙ্গে দুধও দিতে পারেন। ফল খাওয়াও উচিত।"

চা তৈরি করবার জন্যে শৈলবালা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সরোজবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এক সঙ্গে ছ' দাগ ওষুধ না আনলে কি চলে না? হয়তো তিন দাগ খেলেই অসুখটা সেরে যাবে।"

পরের দিন দিলীপ যখন এল তখন শৈলবালা তাঁর নিজের ঘরেই ছিলেন। সরোজবাবুর সঙ্গে তিনি সুকুমারীর গহনার একটা মোটামুটি হিসেব করছিলেন। রবিবার বলে সরোজবাবু আজ বাড়িতেই আছেন। নন্তু গেছে পার্কে খেলা করতে। সে এখনো ফেরে নি।

দিলীপ যে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে, শৈলবালা তা টের পেলেন। তিনি বললেন, "চলো, ও ঘরে গিয়ে বসি। দিলীপ এসেছে।"

"একটু দাঁড়াও। হিসেবটা শেষ করে ফেলি। শুধু গহনার হিসেব করলেই তো চলবে না। আমি একটা ফর্দ তৈরি করে রেখেছি—"

সরোজবাবু ফতুয়ার পকেট থেকে ফর্দ বার করলেন। শৈলবালা চোখে চশমা লাগিয়ে ফর্দের ওপর চোখ বুলতে লাগলেন।

হাতের ব্যাগটা চেয়ারের ওপর রেখে দিলীপ জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ, সুকু? জ্বর কত?"

"নিরেনব্বই।"

"ওষুধ খাও নি?"

"তিন দাগ খেয়ে ফেলেছি, শিশিতে আর ওষুধ নেই। ...আমার জ্বর বোধহয় সারবে না, দিলীপদা।"

'সারতেই হবে'—দিলীপ বসে পড়ল সুকুমারীর পাশেই, বসে পড়ে বলল, "হাতটা দাও দিকি।"

"জ্বর বোধহয় আমার হাতে নেই, মানে এত অল্প জ্বর যে তুমি নাড়ি টিপে তা ধরতে পারবে না। দিলীপদা, আমার বিয়ের তারিখ তো এগিয়ে আসছে—"

"আমি তাই প্রত্যেক দিনই ক্যালেণ্ডারে তারিখ দেখি।"

"কেন ? প্রত্যেক দিনই তারিখ দেখ কেন ?"

"সেই লাল-অক্ষরের দিনটার কথা ভাবি।"

"কি লাভ তাতে, দিলীপদা ?"

দিলীপ সরকার সহসা জবাব দিল না। সুকুমারীর দিকে আরও একটু ঘেঁষে বসল সে। কি ভাবছিল দিলীপ ডাক্তার ? বর্ধমানের হাসপাতালে তার একটা চাকরি হওয়ার কথা হচ্ছে। হয়তো কাল-পরশুর মধ্যে পাকা খবরটা এসেই যাবে। সুকুমারীকে কথাটা বললে বোধহয় ভালই হয়। কিন্তু তার আগেই সুকুমারী বলল, যা বলবার তাড়াতাড়ি বলো। কথা বলবার এমন সুযোগ তো তুমি কোনদিনই পাওনি।"

"না, পাই নি। তোলা উনোনের পাশে তোমার মা আমায় পুরো একটা বছর বসিয়ে রাখলেন।...বোধহয় ভালই হয়েছে তাতে। মনের কথাটা আগুনের তাপে পুড়ে পুড়ে পাকা সোনার মত খাঁটি হয়ে উঠল। সুকু, তোমায় যে আমি ভালবাসি তা কি তুমি বুঝতে পার নি ?"

এতটা পর্যন্ত সুকুমারী বুঝতে পেরেছিল অনেক দিন আগেই। জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না সে। সুকুমারী শুধু দিলীপ সরকারেরর হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা

করল, "লাল-অক্ষরে লেখা তারিখটাকে তুমি নিজে কি জয় করে নিতে পার না, দিলীপদা ?"

ঘরের দরজায় উঁকি দিলেন বোস-গিন্নী। যা দেখবার সবই দেখলেন তিনি। অপেক্ষা করলেন না। 'শৈল কোথায় ? শৈল—' বলতে বলতে বোস গিন্নী এগিয়ে গেলেন বড় ঘরটার দিকে। সরোজবাবু বললেন, "উনি ভেতরেই আছেন।"

ভেতরে এসে বসতে চাইলেন না নিত্যবন্ধুর মা। শৈলবালা বললেন, "ফর্দটা একটু দেখে যাও, দিদি।"

"নাঃ—সুকুমারীকে দেখতে এসেছিলুম। দেখা শেষ হল।"

"আজও ওর নিবেদনবই চলছে।"

"ওর মানে ?" বিস্মিত-স্বরে প্রশ্ন করলেন বোস-গিন্নী।

"সুকুর।"

"আমি তো দেখলুম দিলীপের নাড়ি টিপছে সুকুমারী। শৈল, আজ চলি। একেবারে বিয়ের দিন আসব।" এই বলে তিনি বেরিয়ে এলেন ঘব থেকে। নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। শৈলবালা ক্লান্ত। শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

একটু বাদেই নন্তু এসে জিজ্ঞাসা করল, "মা তুমি শুয়ে পড়লে যে ?"

"এই হতভাগা, যা তো থারমোমিটারটা নিয়ে আয়। আমার বোধহয় জ্বর এল।"

নন্তু নিয়ে এল থারমোমিটার। শৈলবালা নিজেই তাঁর

জ্বর মাপলেন। নিরেনব্বই। নন্তু দেখল মা কাঁদছেন। ফ্যাল ফ্যাল করে সে চেয়ে রইল মায়ের দিকে। নন্তুও অসুস্থ বোধ করতে লাগল। ওরও জ্বর এল নাকি? থারমোমিটার লাগাল নন্তুও।

সরোজবাবু এসে উপস্থিত হলেন ঘরে। পেছনে পেছনে দিলীপও এসে উপস্থিত হল। নন্তু থারমোমিটার নিয়ে গেল কেন?

নন্তু বলল, "বাবা মায়ের নিরেনব্বই।"

"তুই আবার জ্বর মাপছিস কেন?"

আলোর সামনে থারমোমিটার তুলে ধরে নন্তু ঘোষণা করল, "আমারও নিরানব্বই বাবা।"

ডাক্তার দিলীপ সরকার বলল, "থারমোমিটারটা তা হলে খারাপ।"

শেষ পর্যন্ত গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটেই একটা ফ্ল্যাট পাওয়া গেল। রাস্তাটা খুব বেশি লম্বা নয়—ধর্মতলার ট্রাম-রাস্তা থেকে শুরু হয়ে গ্র্যাণ্ট স্ট্রীট শেষ হয়েছে সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোডের গায়ে। একমাত্র সুরেন্দ্র ব্যানার্জি নামটাই পরিচিত, নইলে ও-অঞ্চলের কোন কিছুই চেনেন না অধ্যাপক অম্বিকা গুপ্ত। রাস্তার দু ধারে সারি সারি দোকান। কাপড়ের দোকানই বেশি। সাইনবোর্ড পড়ে পড়ে অধ্যাপক অম্বিকা গুপ্ত বুঝতে পেরেছেন যে, এখানে বাঙালীর দোকান একটিও নেই। বাঙালী-দোকান তো দূরের কথা, গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটের রাস্তা দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশজন বাঙালী যাওয়া-আসাও করে না। একতলায় দোকান, দোতলা আর তিনতলায় সব ফ্ল্যাট। প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটে অবাঙালীর আড্ডা—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ভিড়ই সব চেয়ে বেশি। দিল্লীওয়ালা মুসলমান কিংবা পার্সীদের ভিড়ও কম নয়। অধ্যাপক অম্বিকা গুপ্ত গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটের প্রত্যেকটা বাড়ির দোতলা, তিনতলা এবং চারতলা পর্যন্ত উঁকি দিয়ে এসেছেন, না, কোথাও একটি বাঙালীর মুখ তিনি দেখতে পান নি।

গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটের কোন ফ্ল্যাটেই বাঙালী থাকে না। এখানকার রাস্তার ভিখিরীগুলো পর্যন্ত অবাঙালী। এই ধরণের এতগুলো সুবিধে এখানে আছে বলেই অম্বিকা গুপ্ত বহু চেষ্টার পরে

৫

এখানে একটা ফ্ল্যাট পেয়েছেন। বি,এ, কিংবা এম,এ, পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পাস করবার জন্যে এত বেশি চেষ্টা করতে হয় নি তাঁকে। কিন্তু একটা ফ্ল্যাট খুঁজে বার করতে তিনি কিই না করলেন। মাইনের টাকা থেকে দশ পারসেন্ট টাকা চলে গেল দালালের পকেটে। তিনি রিকশাতে চেপে ঘুরে বেড়ালেন প্রায় গোটা কলকাতাটা। হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার কারণ দেখিয়ে তিনি কলেজ থেকে ছুটি নিলেন ফ্ল্যাট খোঁজবার জন্যে। বাঙালীশূন্য পাড়ায় তাঁর একটা ফ্ল্যাট চাই। চীনেদের সঙ্গে থাকতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু চীনেপাড়াতেই বা ফ্ল্যাট কই? শেষ পর্যন্ত গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটে তিনি জায়গা পেলেন। দুখানা পাশাপাশি ঘর। সামনে-পেছনে বারান্দা। পেছনের বারান্দাটা ডাইনিং-রুম হিসেবে ব্যবহার করা চলে। বেশ ভাল ব্যবস্থা। সমাজ-টমাজের ঝামেলা নেই। আত্মীয়স্বজনেব যাওয়া-আসার রাস্তা বন্ধ। কে বিশ্বাস করবে যে, অম্বিকা গুপ্ত গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটের ফ্ল্যাট-বাড়িতে বাস করেন? তাঁর কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ পর্যন্ত অম্বিকা গুপ্তের নতুন ঠিকানা জানেন না। কলেজের সহকর্মীরা জানেন যে, তিনি হ্যারিসন রোডের 'পান্থ-শালা'তেই বাস করছেন। পান্থশালার বন্ধুরা জানেন যে, তিনি বালিগঞ্জের দিকে উঠে গেছেন। বালিগঞ্জের দিকে তিনি উঠে যেতে পারতেন। কিন্তু তাঁর শ্বশুর শ্রীসুধীরকুমার দাশ ঐ অঞ্চলে থাকেন বলে অম্বিকাবাবু গোটা বালিগঞ্জকেই বর্জন করেছেন। শ্বশুরবাড়ি থেকে দূরে না থাকলে তাঁর অসুবিধে

হত অনেক। সামাজিক নিয়ম মানতে হত তাঁকে। তাতেও অম্বিকা গুপ্তের নিজের খুব একটা ভীষণ রকমের বিপদ কিছু হত না—বিপদ হত অতসীর। অতসী হচ্ছে তাঁর স্ত্রী। সুধীর দাশের কন্যা। একমাত্র সন্তান। শ্রীসুধীর দাশ হচ্ছেন স্বরাষ্ট্র বিভাগের কি এক হোমরা-চোমরা অফিসার।

দুখানা পাশাপাশি ঘর। দুটোই শোবার ঘর। দক্ষিণ-দিকের ঘরখানা অতসীর, পুরোটাই অতসীর। উত্তর দিকের ঘরটাতে থাকেন অম্বিকা গুপ্ত। এক কোণায় একটা ফোল্ডিং খাট। ইচ্ছে করলে দু মিনিটের মধ্যেই খাটখানা গুটিয়ে নিয়ে অম্বিকা গুপ্ত নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারেন। নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন বলে মনে মনে একবার তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন। শ্বশুরকে তিনি আজ আর ভয় করেন না। কংগ্রেসী আমলের স্বরাষ্ট্র বিভাগের বড় কর্তা তো কলকাতার বাড়িওয়ালার চেয়েও নরম মানুষ। তবে? তবে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান নি কেন?

দুখানা পাশাপাশি ঘর, ষোল ফুট বাই দশ ফুট। পাঁচ ফুট বাই তিন ফুটের মত ছোট্ট ঘর হলেও অম্বিকা গুপ্তের অসুবিধে হত না। গা এলিয়ে তিনি শুয়ে থাকেন ফোলডিং খাটের ওপর। কোন বিশেষ দেশে কিংবা কোন বিশেষ ঘরে তিনি শুয়ে আছেন বলে মনে হয় না তাঁর। শুতে হয় বলে শুয়ে থাকেন, ঘুমতে হয় বলে ঘুমন।

ঘরের এক কোণায় তিনটে কাঠের বাক্স সাজানো রয়েছে। বেশ বড় বড় বাক্স তিনটে। বাক্সগুলোতে বই আছে। বেশির

ভাগ বই তাঁর ইতিহাসের। অম্বিকা গুপ্ত কলেজ স্ট্রীটের কলেজে পড়ান। গ্র্যাণ্ট ীটে উঠে আসবার পরে বাক্সগুলো বন্ধই আছে। নতুন করে বিদ্যা অর্জন করবার প্রয়োজন হয় নি তাঁর। প্রয়োজন বোধ করেন নি অম্বিকা গুপ্ত।

দক্ষিণ দিকের ঘরটা অতসীর। দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজা। রাত্রে শোবার সময় অম্বিকা গুপ্ত এদিক থেকে দরজায় খিল লাগিয়ে রাখেন। অতসী প্রথম দু-একদিন আপত্তি করেছিল বটে, কিন্তু অম্বিকা গুপ্ত তাতে কান দেন নি। বিয়ের পর থেকে অতসীকে আলাদা ঘরে শুতে হল বাধ্য হয়ে। বাধ্য করলেন অধ্যাপক অম্বিকা গুপ্ত। তীব্র ইচ্ছা থাকা সত্বেও অতসী কোনদিনও পারে নি অম্বিকাবাবুর ঘরে প্রবেশ করতে। প্রবেশ করতে পারে নি মানে মাঝরাতে প্রবেশ করতে পারে নি। দিনের বেলায় কোন অসুবিধে হয় না, দরজা খোলাই থাকে। দরজা খোলা থাকে বটে, কিন্তু অম্বিকাবাবু থাকেন না। বেলা আটটা বাজতেই তিনি চান করে বেরিয়ে পড়েন বাইরে। গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে খাওয়াদাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি বাইরের হোটেলেই খেয়ে আসেন। অতসীর খাবার আসে টিফিন-কেরিয়ারে করে। আসে হোটেল থেকেই।

আজ অতসীর বাবা রাত প্রায় নটার সময় হঠাৎ অতসীকে এসে নিয়ে গেছেন বালিগঞ্জে। অম্বিকাবাবু তখন গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটে ছিলেন না। থাকলেও তিনি শ্বশুরকে বাধা দিতেন না। এ সময়

মেয়ে তো বাপের বাড়িতে যাবেই। এ সময় মানে, সন্তান হওয়ার সময়। অতসীর সন্তান হওয়ার সময় হয়েছে।

রাত দশটার সময় তিনি ফ্ল্যাটে ফিরে এলেন। বাইরের ফটকে বাড়িওয়ালার দরওয়ান বসে ছিল। অম্বিকাবাবু দরওয়ানের কাছেই খবর পেলেন যে, অতসী তার বাবার সঙ্গে চলে গেছে বালিগঞ্জে। ঘরের চাবিটা দরওয়ানের হাত থেকে নিয়ে নিলেন অম্বিকাবাবু। অতসী যদি চাবিটা সঙ্গে করে নিয়ে যেত তাতেও কোন অসুবিধা হত না তাঁর। অম্বিকাবাবুর পকেটে ডুপ্লিকেট চাবি আছে।

তালা খোলবার আগেই, সিঁড়ির ওপরে দেখা হয়ে গেল বাজাজ সাহেবের সঙ্গে। কুন্দনলাল বাজাজ। পাঞ্জাবি। অম্বিকাবাবুর ডান পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন। পশ্চিম পাঞ্জাবের মানুষ। লাহোরে তাঁর মস্তবড় কারবার ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সময় তিনি লাহোরেই ছিলেন। মস্ত ধনী এবং মানী লোকই ছিলেন কুন্দনলাল বাজাজ। তারপর? তারপর ঘরবাড়ি, টাকাপয়সা সব কিছু ফেলে তাঁকে একদিন পালিয়ে আসতে হল ভারতবর্ষে। সঙ্গে তাঁর কেবল বউ ছিলেন। বউকে সঙ্গে নিয়েই তিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এলেন। গভর্নমেণ্টের সাহায্য ছাড়াই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করলেন তিনি—যে-কোন রকম কারবারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই তাঁর আত্মসম্মান বাঁচে। কোথাও কিছু হল না। দিল্লী, কানপুর, বোম্বাই কোথাও তিনি কিছুই করতে পারলেন না। লজ্জায়

এবং অপমানে মুখেব সাদা রঙ তাঁর কিঞ্চিৎ কালো হয়ে গেল। লজ্জা এবং অপমান থেকে তিনি শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেলেন কলকাতায় এসে। কারবার খুললেন এখানে। পুরনো লোহার কারবার। কারবার খুলতে সাহায্য করলেন আরও দশজন পাঞ্জাবি। দ্বিতীয় মাস থেকেই তাঁর মুনাফা আসতে লাগল। পরিশ্রম, পুরুষকার এবং পুঁজি থাকলেই যে কলকাতায় কারবার ভাল চলে তেমন মন্তব্য বাজাজ সাহেব প্রায়ই প্রকাশ করেন অম্বিকাবাবুর কাছে। বাঙালীবা তবে ব্যবসা কবতে পারে না কেন? গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটের এই দোতলার ফ্ল্যাটে বসে অম্বিকাবাবু প্রশ্নটার জবাব খোঁজেন। কুন্দনলাল বাজাজদের দেখে দেখে প্রশ্নটার জবাব তিনি পান। পান, কিন্তু প্রকাশ করেন না।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসতেই বাজাজ সাহেব বললেন, "আপনাকে ফোনে কে যেন ডাকছেন।" দোতলায় সাতটা ফ্ল্যাট। কোন ফ্ল্যাটেই ফোন নেই। ফোন আছে কেবল বাজাজ সাহেবের ঘরে। অম্বিকাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "বহীনজী কি ঘরে আছেন?" বাজাজ সাহেবের বউকে বোন ছাড়া কি বলেই বা ডাকবেন তিনি? বাজাজ সাহেব সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নেমে গেলেন। নেমে যেতে যেতে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনি যান। আমার এক শালী এসেছে দিল্লী থেকে। দাঙ্গার সময় লাহোর থেকে ওকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ছ-মাস পরে আমরা ওকে উদ্ধার করে নিয়ে

আসি। বড় ভাল মেয়ে।”—এই বলে তিনি নেমে গেলেন নিচে। মেয়ে ভাল কি খারাপ অম্বিকাবাবু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার চেষ্টা করলেন না। তিনি এসে দাঁড়ালেন বাজাজ সাহেবের ঘরের সামনে। আঙুল দিয়ে টোকা মারলেন দরজায়। দু-তিনবার টোকা মারতেই দরজা খুলে গেল। দরজা খুলে দিলেন বাজাজ সাহেবের শালী।

অম্বিকাবাবু দেখলেন মেয়েটিকে। বোম্বাই কিংবা কলকাতার যে-কোন ফিল্মের অভিনেত্রীর চেয়ে অনেক ভাল দেখতে। সাধারণ ভাল নয়, মেয়েটি খুবই সুন্দরী। বাজাজ সাহেবের স্ত্রীর বোন বলে বোঝা যায় না।

ইতিহাসের অধ্যাপক অম্বিকা গুপ্ত হাস্যকর হিন্দী ভাষায় প্রশ্ন করলেন, “আমায় কি ফোনে কেউ ডাকছে” ?

পাশের ঘর থেকে বাজাজ সাহেবের বউ বেরিয়ে এলেন এই সময়। বললেন, “ভেতরে আসুন ভাই সাহেব।”

“আমার টেলিফোন—”

“হ্যাঁ, ভাই সাহেব, টেলিফোন এসেছিল। খবরটা আমি কাগজে লিখে রেখেছি।”

“কি খবর ?”—জিজ্ঞাসা করলেন অম্বিকাবাবু।

“আপনার স্ত্রী বালিগঞ্জে যায় নি।”

“আর কোন খবর নেই ?”—বিরক্তির সুর ফুটে বেরুলো অম্বিকাবাবুর গলার স্বরে।

বাজাজ সাহেবের স্ত্রী এবার অম্বিকাবাবুর হাতে একটা টুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে বললেন, "নার্সিং হোমে গেছে, ঐ কাগজটাতে তার ঠিকানা লেখা আছে।"

নিজের ঘরে ফিরে এলেন অম্বিকাবাবু। ফোল্ডিং খাটের ওপর শুয়ে পড়লেন তিনি। শুয়ে রইলেন প্রায় এক ঘণ্টা। গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটের কোথায় যেন ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার শব্দ হল। প্রত্যেকটা শব্দ তিনি গুনলেন। রাত বারটা বাজল। তেইশ পার হয়ে চব্বিশ বছর চলছে তাঁর, বিছানায় শুয়ে তাও গুনলেন তিনি।

ঘুম আসছে না অম্বিকাবাবুর। গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে অম্বিকাবাবুর ঘুম হয়তো কোনদিনই আসবে না। তিনি এবার উঠে বসলেন। রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। এত রাত্রে গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটে আর লোক নেই। থাকলেও তিনি দেখতে পেতেন না। চোখ দুটো তাঁর কি রকম ঝাপসা হয়ে এল। বোধ হয় চোখের জল তিনি আর রুখতে পারলেন না।

প্রায় সাত মাস এক সঙ্গে থাকবার পর অতসী আজ চলে গেল। বালিগঞ্জে সে যেতে পাবে নি। গেলে নিশ্চয়ই অনেক রকমের কথা উঠত। সেই জন্যেই অতসীর বাবা ওকে এখান থেকে সোজা নিয়ে তুলেছেন নার্সিং হোমে। বালিগঞ্জের কেউ জানতেও পারবে না যে, অতসী নার্সিং হোমে গেছে। গ্র্যাণ্ট স্ট্রীট থেকে বালিগঞ্জ তিন কি চার মাইল

দূর বটে। কিন্তু সমাজ-জীবনে গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটের পরিচয় কিছু নেই। নেই বলেই অতসী সাতটা মাস এখানে কাটিয়ে গেল খুবই পরিচ্ছন্নভাবে। সামাজিক কুৎসার ময়লা ওর গায়ে লাগল না। লাগতে দিলেন না অধ্যাপক অম্বিকা গুপ্ত। গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটে ফ্ল্যাট খুঁজে পেয়েছেন তিনি-ই। এবং গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটই রক্ষা করল অতসীকে সব রকম কুৎসার হাত থেকে। অতসীর বাবা এবং নতুন-পরিচিত ডাক্তার অন্নদা সেন ছাড়া এখানকার ঠিকানা আর কেউ জানেন না। গত সাত মাসের মধ্যে ডাক্তার সেন এখানে দুবার এসেছেন অতসীকে পরীক্ষা করবার জন্যে। রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অম্বিকাবাবু ভাবলেন যে, ডাক্তার সেনের নার্সিং হোমেই সম্ভবত অতসীকে নিয়ে গেছেন সুধীরবাবু।

বাঁ দিকের ফ্ল্যাটে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেমসাহেব থাকেন। অম্বিকাবাবু চেনেন তাঁকে। তিনিও চেনেন অম্বিকাবাবুকে। পাশাপাশি ফ্ল্যাট, না চিনবার কারণ নেই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অম্বিকাবাবু দেখলেন যে, মেমসাহেবটি এখনো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পাউডার মাখছেন। রাত এখন বারটার বেশি, বোধ হয় একটা হবে। খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন অধ্যাপক অম্বিকা গুপ্ত। এত রাত্রে এই অল্পবয়সের মেয়েটি মুখে পাউডার মাখেন কেন? কে আসবে তাঁর কাছে? রাস্তায় তো একটিও লোক নেই।

পাউডার মাখা শেষ করে মেম সাহেবটিও তাঁর ঘরের

সামনে এসে দাঁড়ালেন, রাস্তার দিকের বারান্দায়। অম্বিকা-বাবু সরে যাচ্ছিলেন, মেয়েটি সহসা জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছ মিস্টার গুপ্ত ?"

"অ্যাঁ ? তুমি আমার নাম জান নাকি ?"

"জানি।"—লিপ-স্টিক মাখা ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে তুললেন মেমসাহেব।

অম্বিকাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার নাম জানলে কি করে ?"

"কেন, বাড়িওয়ালার দরওয়ানের কাছে।"

"বাড়িওয়ালার দরওয়ানের কাছে আমার নাম জানতে গেলে কেন ?"

"না জানলে আমাদের চলবে কি করে মিস্টার গুপ্ত।" ইচ্ছাকৃত চাপা-হাসির প্রয়াস পেল মেমসাহেবের মুখে। খানিকটা ঢলে পড়বার ভঙ্গি করে তিনিই পুনরায় বললেন, 'তোমার বউ তো আজ চলে গেলেন—"

"তুমি জানলে কি করে ?"

"কেন, আমি নিজের চোখেই তো দেখলাম। হাত-পা-গুলো রোগা-রোগা—আর পেটের দিকটা—ও কি মিঃ গুপ্ত, ভেতরে চলে যাচ্ছ কেন ? কমাস হল তাঁর ?"

প্রশ্নটার জবাব দেবেন কি না ভাবছিলেন অম্বিকাবাবু। ভেবে নিয়েই তিনি জবাব দিলেন, "দশ মাস। তাই নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছে আজই। তোমার কোন ছেলে-পিলে নেই ?"

"মাই গুডনেস! ছেলেপিলে থাকলে আমাদের কাছে লোক আসবে কেন? আজ তো একজনও কেউ এল না। মিঃ গুপ্ত, তোমার খুব খারাপ লাগছে আজ, না? বড্ড একা একা বোধ হচ্ছে, না? আমিও আজ একা। আসব তোমার কাছে?"

একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অম্বিকাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার কাছে কেন? কি চাও?"

"সঙ্গ।"

"সঙ্গ?" ভুরু কুঁচকে অম্বিকাবাবুই বললেন, আর—"

বাধা দিয়ে মেমসাহেব বললেন, "আর কি চাইব—মানে, কমাস থেকে তো তুমি—

"কমাস থেকে নয় মেমসাহেব, একবারে প্রথম মাস থেকেই।"

"অ্যাঁ? প্রথম মাস থেকে কি করে হয়? মিঃ গুপ্ত, কথাটার মানে কি?"

"অত মানে জানতে চেয়ো না। যাক এসব কথা। আমি ঘুমুতে যাচ্ছি, আমার ঘরে এসে তোমার কোন লাভ হবে না।"

লাভ চাই নে মিঃ গুপ্ত, লাভ তো প্রত্যেক দিনই হয়। আজ না হয় কয়েক ঘণ্টা লোকসানই হবে।"

"তোমার লোকসানের প্রতি লোভ থাকতে পারে, আমার নেই। জানো আমার বয়স মাত্র চব্বিশ?"

"বাই জোভ। আমিও তোমার চেয়ে বড়, আমার পঁচিশ।"

এই বলে মেমসাহেবটি হাতের রুমাল দিয়ে ঠোঁটের রঙ যেন একটু একটু করে উঠিয়ে ফেলতে লাগলেন। অম্বিকাবাবু মেমসাহেবের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি এবার ঘুমতে যাও, আমিও চলি।"

"আমি তো রাত্রিতে ঘুমই না, ঘুমই দিনেব বেলা।"

"তা হলে তুমি কি করবে এখন?"—জিজ্ঞাসা করলেন অম্বিকা গুপ্ত।

"আমার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু খালি বিছানায় তোমার কি ঘুম আসবে, গুপ্ত?—" বাবান্দার শেষ-সীমায় অম্বিকাবাবুর দিকে এগিয়ে এলেন মেমসাহেব।

"বিছানা তো আমার খালি প্রথম দিন থেকেই।"

"কেন?"

"সে অনেক কথা, তোমায় বলা যায় না।"

"গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটে বাস কববার সুবিধে এই যে, এখানে সব কিছুই বলা যায় এবং কবাও যায়।"—এই বলে মেমসাহেবটি এবার ঠোঁটেব রঙ সব বেশ ভাল করেই তুলতে লাগলেন। অম্বিকা গুপ্ত মেয়েটিব গলার সুরে এবং মুখের ভাষায় খানিকটা ভদ্রতার আভাস পেলেন। পেলেন বলেই তাঁকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারলেন না।

গ্রাণ্ট স্ট্রীট বালিগঞ্জ নয়। নয় এমন কি বাংলা দেশের

অংশও। এখানে কেউ কাউকে উপেক্ষা করে না। অম্বিকাবাবুও তাই মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "ঠোঁটের রঙ সব মুছে ফেললে, আর কেউ আসবে না বুঝি ?'

"না, সে আর আসবে না।"

"সে ? সে কে ? মানে, বিশেষ কেউ নাকি ?"

"তা তোমায় বলব কেন ?"—মেয়েটি যেন সহসা গম্ভীর হয়ে গেলেন।

অম্বিকাবাবু মেমসাহেবের দিকে বেশি করে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার তো রাত্রে আর ঘুম আসবে না, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার জীবনীটা শুনলে কিন্তু ভালই হত। সমস্তটা রাত গল্প করলেও কেউ কোন প্রশ্ন করবে না।"

"করবে গুপ্ত, কেউ যদি দেখতে পায়। ভাবছ, তোমার আর আমার মধ্যে দূরত্ব বুঝি খুব বেশি ? তুমি কি বোকা। হবেই তো, বয়স মাত্র চব্বিশ। এবার আমি চললুম।" —চলেই যাচ্ছিলেন মেমসাহেব, এমন সময় অম্বিকাবাবু মুখটা তাঁর পাশের বারান্দার দিকে এগিয়ে নিয়ে বেশ মিষ্টি সুরেই জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার রাত কাটবে কি করে ? বই-টই কিছু পড়বে ? আমার ঘরে অনেক বই।"

দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মেমসাহেব জবাব দিলেন, ''না, আমার ঘরেও বই আছে।"

"তোমার ঘরে কি বই মিস্—?"

"মিস্ নয়, মিসেস্—"

"মিসেস কি ?"

"তা বলব না। সেইটেই আমার সব চেয়ে বড় সিক্রেট, আর—"

"আর কি ?"—হাতীর শুঁড়ের মত মুখ বাড়িয়ে দিলেন অম্বিকা গুপ্ত।

"আর সেইটেই সবচেয়ে হোলি। গুড নাইট, গুপ্ত।"

দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন তিনি। অম্বিকাবাবু যেন শেষ বারের মত তাঁর সঙ্গে কথা কইছেন এমন ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "বইটার নাম বললে না তো।"

"বইটা হচ্ছে হোলি বাইবেল।"

"বাইবেল ? বাইবেল তুমি পেলে কোথায় ?"

"সে ফেলে গেছে, গুপ্ত।"—দরজা বন্ধ করলেন মেমসাহেব।

অম্বিকাবাবু চলে এলেন নিজের ঘরে। বসে পড়লেন ফোল্‌ডিং খাটের ওপর। রাত এখন ক'টা ? দুটোর কম নয়, ভাবলেন অম্বিকাবাবু। বাকী রাতটুকু বোধ হয় আর ঘুম আসবে না। ঘরে তো বই অনেক, কি বই পড়বেন তিনি ? এমন একটা বিশেষ রাত্রে কি বই পড়া যায় ? আজকের এই রাতটা কাটাবার মত কোন বই কি কেউ লিখতে পেরেছে ? না, পারে নি—ভাবলেন অম্বিকাবাবু। মেমসাহেবটিকে ডেকে নিয়ে এলে কেমন হয় ?

সাত মাস পরে অতসী আজ চলে গেল। বিয়ের প্রায়

এক বছর আগেই অতসীকে চিনতেন তিনি। রবিকরের মাসতুতো বোন অতসী। রবিকর ছিল অম্বিকাবাবুর সহপাঠী। একসঙ্গে বি, এ, পড়তেন। রবিকর বি, এ, পাস করতে পারল না। পাস করবার জন্যে কোন চেষ্টাও ছিল না তার। রবিকরের বাবা ছিলেন মস্ত ধনীলোক। চারটে না পাঁচটা চা-বাগানের মালিক। বি, এ, পরীক্ষায় ফেল করবার পরে রবিকর তার বাবার অফিসে ঢুকে পড়ল কাজ শেখবার জন্যে। কাজ হয়তো সে সত্যিই শিখছে কিন্তু অম্বিকাবাবুর সঙ্গে তার আব দেখা হয় না। দেখা হওয়ার সহজ রাস্তা বন্ধ কবে দিয়েছে রবিকর নিজেই। আব কেউ না জানুক, রবিকর আর তাব মাসতুতো বোন অতসী নিশ্চয়ই জানে যে, এমন একটা সাংসাবিক বিপর্যয়ের জন্যে অম্বিকাবাবুব কোন দায়িত্বই ছিল না।

অতসীকে ভালবাসতেন তিনি। রবিকব যেদিন তাঁকে প্রথম নিয়ে এল অতসীদের বাড়িতে, সেদিন থেকেই তিনি অতসীকে ভালবাসেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম! অম্বিকাবাবু থাকতেন বউবাজারেব কোন একটা রাস্তাব মেসে। সেখান থেকে তিনি কলেজ স্ট্রীটে আসতেন এম, এ, পড়তে।

খুট্ করে শব্দ হল দবজায়। কেউ এল না কি? কে আসবে এত রাত্রে? মেমসাহেব নয় তো? চুপ কবে বসে রইলেন অম্বিকাবাবু। দরজার দিকে কান পেতে রাখলেন। না, কেউ নয়। আলো জ্বালাবার দরকার নেই। অন্ধকার ঘরে বসে অম্বিকাবাবু ভাবতে লাগলেন আগেকার কথা।

কী গরীব সংসারেই না তিনি জন্মেছিলেন। বাবা কাজ করতেন মেহেরপুর জমিদার-বাড়ির কাছারিতে। হিসেবের খাতা লিখতেন। মাস গেলে মাইনে পেতেন ত্রিশ। অম্বিকাবাবুর বয়স যখন চার, তখন তাঁর মা মারা যান। বিশেষ কিছু অসুখ-বিসুখ হয়েছিল বলে অম্বিকাবাবুর বিশ্বাস হয় না। মা বোধ হয় না খেতে পেয়েই মারা গেছেন। ত্রিশ টাকায় তিনটে জীবন চলতে পারে না, চললও না, মা মারা গেলেন। বুড়ো জমিদার শশাঙ্ক চৌধুরী বাবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "শুনলুম, তোমার স্ত্রী নাকি ম্যালেরিয়ায় মারা গেলেন ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।" জবাব দিলেন বাবা।

মেহেরপুরের বড়লোকেরা অনাহার রোগকে ম্যালেরিয়া বলতেন। কী বিচিত্র এ দেশের সমাজব্যবস্থা। যে জমিদার বাবাকে ত্রিশ টাকার বেশি মাইনে দিতেন না, তিনিই আবার অম্বিকাবাবুকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাতেন কলকাতায়। মেহেরপুর হাই ইস্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিক পাস করবার পরে শশাঙ্ক চৌধুরীই তাঁকে টাকা দিয়ে কলকাতায় পাঠালেন আই, এ, পড়বার জন্যে। আই, এ, পরীক্ষায়ও তিনি বৃত্তি পেলেন। বি, এ, এবং এম, এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাস করলেন। বুড়ো শশাঙ্ক চৌধুরী গেল-বছর মারা গেলেন। মরবার আগে তিনি অম্বিকাবাবুকে একবার দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যান নি, যেতে পারলেন না। গেল-বছর ঠিক সেই সময় তিনি বিয়ে করলেন অতসীকে।

কেবল বিয়ে করছেন বলে নয়, পাস করবার অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কলেজে চাকরি পেয়েছেন বলেও তাঁর মেহেরপুরে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

মেহেরপুরে তিনি যাবেন। অতসীকে সঙ্গে করে নিয়ে না গেলে বাবাই বা কি বলবেন? তিনি তো আজও বউ দেখেন নি। লোকের মুখ থেকে বাবা কি জানতে পারেন নি যে, তিনি বিয়ে করেছেন? অম্বিকাবাবু আজও তাঁর বিয়ের কথা বাবাকে জানান নি। জানান নি তার কারণ, অম্বিকাবাবু মনে করেন যে, তাঁর বিয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। পাপের স্পর্শ তিনি অনুভব করেন মাঝখানের দরজাটা খুলে ফেললেই। গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটে ঘর বেঁধেছেন বলে তিনি তো পাপপুণ্যের সীমারেখা সব মুছে ফেলতে পারেন না। সামাজিক শাসন কিছু নেই বলে নীতির শাসন উপেক্ষা করবেন কি করে? দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন অধ্যাপক অম্বিকা গুপ্ত। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন তিনি!

দু ঘরের মাঝখানের দরজাটা আজ খোলাই পড়ে রয়েছে। অতসী আজ ওখানে নেই। অম্বিকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। অতসীর ঘরে তিনি কোনদিনও প্রবেশ করেন নি। চব্বিশ বছরের যুবক অম্বিকাবাবু অতসীর ঘরে ঢোকবার চেষ্টাও করেন নি। অতসীর আন্তরিক আমন্ত্রণ তিনি শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু সে-আমন্ত্রণ তিনি এযাবৎকাল

উপেক্ষা করেই এলেন। পাপের প্রশ্রয় তিনি দিতে পারেন না, কারণ পুণ্যের প্রতি লোভ তাঁর অসীম।

দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেললেন অম্বিকাবাবু। অতসী যখন নেই, তখন পাপও নেই। ঢুকে পড়লেন অতসীর ঘরে। কে যেন তাঁকে আজ ওখানে টেনে নিয়ে গেল। অতসী নয়, এমন কি অতসীর ছায়াও নয়।

সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন তিনি। ড্রেসিং-টেবিলের ওপর প্রসাধনের জিনিসগুলো সব সাজানো রয়েছে। অম্বিকা-বাবু প্রত্যেকটা জিনিস নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলেন। পাউ-ডারের টিনটা পরীক্ষা করে দেখলেন, পুরোই রয়েছে। ইভনিং ইন প্যারিস? না, এক ফোঁটা সেণ্টও অতসী খরচ করে নি। সাতটা মাস অতসী এখানে কাটিয়ে গেল, কিন্তু কই, মুখে তো এতটুকু ক্রীম সে ব্যবহাব করে নি। সাত মাসের মধ্যে এক-দিনও সে বাইরে যায় নি। এই একটা ঘবেব মধ্যে অতসী কাটিয়ে গেল সাতটা মাস। কি ভয়াবহ নিঃসঙ্গ জীবন। মানুষের সংস্পর্শ থেকে আলাদা হয়ে গেল বলেই তো অতসীর উচিত ছিল ঘরের প্রতিটি আসবাব ও বস্তুর সঙ্গে বেশি করে মেলামেশা করা। খুবই বিস্মিত হয়ে গেলেন অম্বিকাবাবু। এত কষ্টেব জীবন কি করে কাটিয়ে গেল অতসী?

তাই তো, ও পাশের ওই শেল্‌ফের দিকটা তো তিনি আগে দেখতে পান নি। ওখানে কি? তাড়াতাড়ি অম্বিকাবাবু এগিয়ে গেলেন শেল্‌ফের কাছে। অম্বিকাবাবু দেখলেন যে,

শেলফের ওপরে খানিকটা নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অতসী কি করে যে তাঁর একটা ফোটো যোগাড় করেছে তিনি তা ভেবে পেলেন না। ফোটোর সামনে সাজানো রয়েছে একটা রেকাবি, রেকাবির ওপরে সিঁদুরের কৌটো এবং কয়েকটা তাজা ফুল। অতসী ফুল পেল কোথায়? কি মনে করে অম্বিকাবাবু সিঁদুরের কৌটোটা তুলে নিলেন হাতে। কৌটোটা খুলে তিনি দেখলেন যে, ওতে সিঁদুরের পরিমাণ খুবই কম। এই ঘরের এত জিনিসের মধ্যে অতসী কেবল সিঁদুরটাই নিয়মিতভাবে ব্যবহার করেছে। নাটক? নাটক ছাড়া আর কি, এই মনে করে অম্বিকাবাবু ড্রেসিং-টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে ফেললেন।

ভীষণভাবে অবাক হয়ে গেলেন অম্বিকাবাবু। মেহেরপুর থেকে তাঁর বাবা তাঁকে চিঠি লিখেছেন। খামের ওপরে তাঁর ঠিকানা লেখা রয়েছে বালিগঞ্জের। বাবা তা হলে তাঁর বিয়ের খবরটা জেনে গেছেন। না জানলে তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা জানলেন কি করে? বাবা দুঃখ পাবেন বলেই তো প্রায় একটা বছর তিনি তাঁর বিয়ের খবরটা তাঁকে দিতে পারেন নি। তাঁকে খবর দিতে সাহস পান নি অম্বিকাবাবু। বৃদ্ধ হয়তো তাঁর এক মাত্র সন্তানের এত বড় অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না। হার্ট-ফেল করে মারা যেতেন।

খামখানা তিনি তুলে নিলেন ড্রয়ার থেকে। অতসী চিঠিখানা খুলেই রেখেছিল। চিঠি পড়তে পড়তে অম্বিকাবাবু এত

বেশি অবাক হয়ে গেলেন যে, সবটা চিঠি তিনি পড়তে পারলেন না। খানিকটা চিঠি পড়েই তিনি বুঝতে পারলেন যে, অতসী নিজেই বাবাকে তাঁদের বিয়ের খবর দিয়েছে। এ কি করে সম্ভব হল? অতসী কি তার পাপের কথা বাবাকে জানিয়েছে? না, সবটা জানায় নি। কিন্তু যতটুকু জানিয়েছে তাতেই বা বাবা ওকে ক্ষমা করলেন কি করে? অম্বিকাবাবু ভাবলেন, বাহাত্তর বছর বয়সের মানুষ বোধ হয় খুনীকেও ক্ষমা করতে পারে। মৃত্যুকে যে এত কাছে দেখতে পায়, সে তো সবাইকেই ক্ষমা করবে। কিন্তু চব্বিশ বছর বয়সের অম্বিকাবাবু অতসীকে ক্ষমা করবেন কি করে?

অতসীর বিছানার ওপর বসে পড়লেন তিনি। বিছানার দিকে ভাল করে দৃষ্টি দিতে গিয়ে অম্বিকাবাবুর মনে হল, অতসী বোধ হয় এ বিছানা কোনদিনই ব্যবহার করে নি। বিছানার চাদরে ভাঁজ পড়ে নি এক ইঞ্চিও। অতসী কি তবে গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটে এসেছিল প্রায়শ্চিত্ত করতে?

গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটের কোথায় যেন ঘড়ির আওয়াজ হচ্ছে—একটা, দুটো, তিনটে। বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করল অম্বিকাবাবুর। বোধ হয় ঘুম আসবে। খুট করে ও-ঘরের দরজায় শব্দ হল। এত রাত্রে দরজায় টোকা দিচ্ছে কে? ভেতর থেকে দরজা তো বন্ধ করে আসেন নি, সম্ভবত সেই মেমসাহেবটি তাঁর ঘরে ঢুকলেন।

অম্বিকাবাবু অতসীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর

নিজের ঘরের দরজায় সত্যিই কে যেন বাইরে থেকে টোকা মারছে। দরজা তো খোলা আছে, মেমসাহেবটি ঘরে ঢুকছেন না কেন? মেমসাহেব বলেই বোধ হয় তিনি ঘরে ঢুকছেন না। মেমসাহেবেরা যত খারাপই হোক না কেন, ভদ্রতা কখনো ভুলে যান না। অম্বিকাবাবু দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

দরজা খুললেন অম্বিকাবাবু। মেমসাহেব নন, বাজাজ সাহেবের শালী। হতভম্বের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। কেমন যেন এলোমেলোভাবে শাড়ি পরেছেন মহিলাটি। হঠাৎ ঘুম ভাঙার জড়তা যেন মহিলাটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছে—আকর্ষণ অনুভব করলেন অম্বিকাবাবু।

অম্বিকাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি? এই সময়ে?" এই বলে হাল্কা ফোলডিং খাট-টা তিনি টেনে নিয়ে এলেন মহিলাটির দিকে। এনে বললেন, "এখানেই বসুন, ঘরে তো চেয়ার-টেবিল কিছু নেই।"

মাথা নেড়ে মহিলাটি বললেন, "রাত তিনটের সময় আমি আর বসব না, বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আমি এসেছিলাম আপনাকে খবর দিতে—"

"খবর দিতে? এত রাত্রে এখানে, কেবল খবর দিতেই এলেন?"

"জী, হ্যাঁ। আপনার টেলিফোন এসেছে।"

"টেলিফোন? ও, বুঝেছি আমার টেলিফোন এসেছে।"

"চলুন, খুব জরুরী খবর আছে—"

জানি, জানি খবর খুব জরুরী, নইলে রাত তিনটের সময় টেলিফোন আসবে কেন? টেলিফোনের রিসিভারটা তো নামানো আছে, আওয়াজ হওয়ার আর ভয় নেই। বাকী রাতটুকু নামিয়েই রাখবেন, নইলে আপনার ঘুম ভেঙে যাবে।"—অম্বিকাবাবু মৃদুমৃদু হাসতে লাগলেন। তাঁর সংজ্ঞাকেন্দ্রে আলোড়ন হচ্ছে। নইলে তাঁর হাসির গায়ে আকাঙ্ক্ষার স্পষ্টতা প্রকাশ পেত না।

অম্বিকাবাবুর ব্যবহারে মহিলাটি খুবই বিব্রত বোধ করলেন। তাঁর ভগ্নীপতি এবং বোনের খুব বিশেষ বন্ধু বলেই তো তিনি এসেছিলেন টেলিফোনের খবরটা পৌঁছে দিতে। নইলে রাত তিনটেব সময কে আসত অম্বিকাবাবুব ঘরে। গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটে কোন সমাজ নেই বটে, কিন্তু ভদ্রতা আছে। অম্বিকা বাবু ভদ্রলোক বলেই তো তিনি জানেন। তবে?

"টেলিফোনে যিনি ডাকছেন, তাঁকে কি বলব?"—প্রশ্ন করলেন বাজাজ সাহেবের শালী।

অধ্যাপক বললেন, "চলুন, আমি যাচ্ছি।"

বাজাজ সাহেবের ফ্ল্যাটেও দুখানা পাশাপাশি ঘর। প্রথম ঘরখানা বাজাজ সাহেবের শোবার ঘর। সামনের দিকের ঘরখানা তাঁর ড্রইং-রুম ছিল। আজকে থেকে এই ঘরখানাও শোবার ঘর হয়েছে। মিসেস বাজাজের বোনের জন্যে এই ঘরে একটা ফোল্ডিং খাট আনা হয়েছে। অম্বিকাবাবু মহিলাটির পেছনে পেছনে এসে উপস্থিত হলেন এই ঘরে। টেলিফোনের

রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যালো কে ?"

ও-পাশ থেকে জবাব শুনলেন তিনি, "আমি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার শ্বশুর, আমি।"

অম্বিকাবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "এত রাত্রে টেলিফোন কেন ?"

"অতসী যে নার্সিং-হোমে এসেছে তুমি কি জান না, অম্বিকা ?"

"জানি। আমি বলছিলুম কি, দরকার থাকলে আপনি চলে এলেই তো পারতেন এখানে। আমি রাত্রিতে ঘুমই না, জেগে বসে থাকি।"

"ওসব পাড়ায় এত রাত্রে যাই কি করে ? কি বললে ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, গ্র্যাণ্ট স্ট্রীট যে কলকাতায় তা কি আমি জানি না ? কলকাতায় তা ঠিক, তবুও মনে হয় যেন চিনি না। ওসব দিকের ফ্ল্যাটে তুমি থাক বলেই তো গ্র্যাণ্ট স্ট্রীট আমায় বাধ্য হয়ে চিনতে হয়েছে। অম্বিকা—হ্যালো হ্যালো—ও, আমি ভাবলুম লাইনটা কেটে দিলে বুঝি!"

"কেটে দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু ওঁকে আবার বিরক্ত করবেন বলেই কাটলুম না। উনি এখানে বসে আছেন ?"

"উনি ? উনি কে ?"

"একজন পাঞ্জাবি যুবতী।"—এই বলে তিনি দৃষ্টি ফেললেন মিসেস বাজাজের বোনের দিকে। বাংলায় বললেন বলেই তিনি বুঝতে পারলেন না। মাথা নিচু করে ফোল্ডিং খাটের

ওপর বসে রইলেন মিসেস বাজাজের বোন। অম্বিকাবাবুর কথা শুনে ওপাশ-থেকে তাঁর শ্বশুর সুধীরকুমার দাশ জিজ্ঞেস করলেন, "ওখানে তো বাজাজ সাহেবের বউ আছেন, যুবতী পাঞ্জাবি আবার কোথা থেকে এল ?"

"দিল্লী থেকে। হ্যালো, হ্যালো—আমি ভাবলুম লাইনটা কেটে দিলেন বুঝি। ও কি রাগ করছেন কেন ? ছি-ছিঃ, আমায় রাস্‌কেল বললেন ? মেয়েটি তো মিসেস বাজাজের বোন। এটা তার বেড-রুম।"

"হ্যালো, তোমার কি লজ্জা বলে কোন জিনিসই নেই ? অতসীর এতবড় সর্বনাশ তুমি করেছিলে—তোমাব কি সে সব কথা মনে নেই নাকি ? তোমার মত এতবড় একটা শিক্ষিত জন্তু ব্রিটিশ আমলেও আমার চোখে পড়ে নি।"

"হ্যালো, মনে রাখবেন, এটা ব্রিটিশ রাজত্ব নয়। স্বরাষ্ট্র বিভাগের হোমরা-চোমরা অফিসাব বলে আর আমায় আপনি যা-তা গালাগালি দিতে পারবেন না। আমি আপনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনব।"

আদালতে গিয়ে বিচাবকের সামনেই তোমায় আমি আরও দশবার শিক্ষিত জন্তু বলে গালি দেব। ব্রুট।"

"ব্রুট আর জন্তু তো একই—হ্যালো, আর পনেরো বছরের মধ্যে ইংরেজী উঠে যাবে, তখন কোন্ ভাষায় গাল দেবেন ?"

কেন, ইংরেজীর বদলে তো হিন্দী আসবে—হ্যালো, কে ? অম্বিকা ? শেম ! অতসীকে পড়াতে এসে কি করেছিলে

মনে নেই ? ওর বেড-রুমে যদি তোমায় ঢুকতে না দিতুম। যাক সেসব কথা। মিসেস বাজাজের বোন কি বিবাহিতা ?”

খুব নরম সুরে অম্বিকাবাবু জবাব দিলেন, “না .”

“কেন ?”

“বর পাওয়া যাচ্ছে না বোধ হয়। সব দেশেই কি আমার মত আহাম্মক পাওয়া যায় ?”

“কেন, কি হয়েছিল মেয়েটির ?”

“রাজনীতির ঘোলা জলে ডুবে গিয়েছিল, স্যার। ওই যে কখন দেশ স্বাধীন হল না কি ? সেই সময় লাহোরে দাঙ্গা হয়েছিল, মনে পড়ে হুজুর ? আপনার পুরনো মালিক ইংরেজের হাত ছিল এই সব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে। মেয়েটি অবশ্যি মরে নি। ছ-মাস পরে পশ্চিম-পাঞ্জাবের কোন এক পাড়াগাঁ থেকে মেয়েটিকে বাজাজ সাহেবরা উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। যাক, রাত তিনটের সময় আপনি আমায় ডেকেছেন কেন ?”

“ছি ছি, তোমার লজ্জা করে না, অম্বিকা তোমার বউয়ের জন্যে আমরা সবাই রাত জাগছি এখানে। বোধ হয় অপারেশন করতে হবে। ডাক্তার সেন ওকে ভাল করে পরীক্ষা করছেন। ঘর থেকে বেরুলে তোমায় ফলাফল সব জানাব, হ্যালো— এই যে ডাক্তার সেন আসছেন। তিনি নিজেই তোমার সঙ্গে কথা কইবেন। হ্যালো—অতসীর কাছে শুনলুম, গত সাত মাসের মধ্যে তুমি নাকি ওর সঙ্গে এক দিনও কথা বল নি ?

এর পরেও অতসীব মত মেয়ে কি করে যে তোমার এত সুখ্যাতি কবে ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই! অতসী আমার একমাত্র সন্তান।"

"ডাক্তার সেন কোথায় গেলেন ?"

"এই যে আসছেন, ধরো। হ্যালো—গলার সুর খুব নিচু কবে তিনিই আবাব বললেন, "অম্বিকা, ডাক্তার সেন আমাদের নতুন পরিচিত মানুষ। ঘবেব কথা তিনি কিছুই জানেন না। তাঁকে যেন ভুল করে কোন রহস্য ফাঁস করে দিয়ো না। ভুল করে অন্তত বিয়ের সন তাবিখ কিছু প্রকাশ করে বস না। অম্বিকা, বাপ হওয়াব ঝকমারি যে কত তা তো তুমি এখনও বুঝতে পারবে না। এক এক বাব মনে হয় পৃথিবীতে মানুষেব চেয়ে বড় আর কিছু নেই। সমাজ, সংসাব, নীতি এবং আরও কত কি—সবই তো মানুষেবই সৃষ্টি। অম্বিকা, তোমার কি মনে হয় ?"

"ডাক্তাব সেন গেলেন কোথায় ?"

"বাথ-রুমে অম্বিকা, দোষ তো সবটুকুই তোমাব, অতসীর তো কোন অপবাধই ছিল না। কিন্তু একটু আগে অতসী কি বলল, জান ?"

"কি বলল ?"—জিজ্ঞাসা করলেন অম্বিকাবাবু।

"একটু আগে, মানে প্রায় এক ঘণ্টা আগে, চিৎকার করছিল অতসী। ডাক্তাব সেন তখনও এসে পৌঁছন নি। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্সের পাশে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। চেঁচাতে চেঁচাতে অতসী কি বলল, জান ? হ্যালো ?"

"শুনছি, বলুন।"

"যুবতী পাঞ্জাবিটি করছে কি ?"

"পাঞ্জাবি যুবতীটি শুয়ে পড়েছেন ফোল্‌ডিং খাটের ওপর। টেলিফোনটা ঠিক ওঁর খাটের পাশেই।

"তুমি দাঁড়িয়ে, না, বসে আছ ?"

"অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম, এখন—"

"এখন কি ?"

"ফোল্‌ডিং খাটের পাশেই বসে পড়েছি। ভয় পাবেন না, পাঞ্জাবি মেয়েরা আপনাদের ওদিকের মেয়েদের মত মোমের পুতুল নন। ইনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ডাক্তার সেনকে একটু দিন।"

"দিচ্ছি। অতসী কি বলল, জান ? হ্যালো—অম্বিকা—অতসী আমায় বলল যে, সন্তান সে চায় না।"

এই পর্যন্ত বলে অম্বিকাবাবুর শ্বশুর হঠাৎ থেমে গেলেন।

এক সেকেণ্ড পর্যন্ত অপেক্ষা করে অম্বিকাবাবু ডাকলেন, "হ্যালো, কে ? ও, শ্বশুর মশাই ?"

"হ্যাঁ।"

"হঠাৎ কথা বন্ধ করে দিলেন কেন ? ওদিকে কিছু হচ্ছে নাকি ?"

"না। ডাক্তার সেন এখনও বাথ-রুমে। আর কি শুনতে চাও, অম্বিকা ?"

"অতসী সন্তান চায় না কেন ?"

"তোমারই পাপের জন্যে বোধ হয়। তুমি পাপ করেছ বলেই সে সন্তানটাকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসতে বলছে।"

হ্যালো—"অম্বিকাবাবুর গলার স্বর কাঁপতে লাগল, "হ্যালো, ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার কথাটা সত্যি নাকি ?"

"পাগল হয়েছ তুমি ? ব্যথাটা বোধ হয় অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই ভুল বকছিল, হ্যালো, এই যে ডাক্তার সেন এসেছেন। ধরো।"

"ধরেছি। কে ? ডাক্তাব সেন ? বলুন, আমি অম্বিকা গুপ্ত কথা বলছি। কি বললেন ? অপারেশন করতে হবে ? ও হ্যাঁ, কালকেই অপারেশন করা দরকার ? হ্যালো, কি বললেন ? দুজনকে বাঁচানো যাবে না ?"

ওধার থেকে ডাক্তার সেন জবাব দিলেন, "না, মিঃ গুপ্ত, দুজনকে বাঁচানো চলবে না বোধ হয। কি চাই আপনার— স্ত্রী, না, সন্তান ?"

"আজই জবাব চান না কি ?"—জিজ্ঞাসা করলেন অম্বিকাবাবু। ডাক্তার সেন বললেন, হলে ভালই হত। কাল সকালে বললেও চলবে। বলার আর আছেই বা কি ? এমন অবস্থায় সবাই যা চায়, আপনিও তাই চাইবেন নিশ্চয়ই। হ্যালো ? সবাই তো বউ চায়—বউ থাকলে সন্তান আবার হবে। আচ্ছা, আচ্ছা, কাল সকালে আটটা নাগাদ এলেই চলবে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, অপারেশন করতে হবেই। গুড নাইট।"

"গুড নাইট।"—অম্বিকাবাবু রিসিভারটা রেখে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

পরের দিন কলেজে গেলেন না অম্বিকাবাবু। বেলা আটটার সময় নার্সিং-হোমে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেখানেও যাবেন না বলে মনে মনে ঠিক করে রাখলেন তিনি। অপারেশন করবেন ডাক্তার সেন, তাঁর তো কোন কাজ নেই সেখানে। অতএব ফোল্ডিং খাটের ওপরে শুয়ে প্রায় সমস্তটা দিনই তিনি কাটিয়ে দিলেন গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে। ঘুম আসে নি তাঁর। টেলিফোনে খবর আসবে বলে বোধ হয় তিনি ঘুমতে পারেন নি। অপারেশন হল কি না, তা তিনি জানেন না—কে বাঁচল আর কে মরল তার খবরও তিনি কিছু পেলেন না। হয়তো দুজনের জীবনই রক্ষা পেয়েছে বলে কেউ তাঁকে টেলিফোন করে নি।

বেলা তিনটের সময় ঘরে ঢুকলেন মিসেস বাজাজ। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন অম্বিকাবাবু। বোধ হয় খবর এসেছে। বাচ্চাটা বোধ হয় বাঁচে নি।

মিসেস বাজাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "খবর কি ভাই সাহেব?"

"খবর?"—হতাশার সুরে অম্বিকাবাবু বললেন, "খবর কিছুই জানি না। কাল ডাক্তার যা বললেন, তাতে মনে হয়, বাচ্চাটাকে বাঁচানো যাবে না।"

"কেন ? কেন, ভাই সাহেব ?"—মিসেস বাজাজের মুখে উৎকণ্ঠার ধ্বনি।

"অপারেশন করতে হবে। ডাক্তার বললেন যে, দুজনকে বাঁচানো যাবে না। স্ত্রী কিংবা সন্তান দুজনের মধ্যে আমায় একজনকে বেছে নিতে হবে। ভাবছি—"

"কি ভাবছেন ?"

"ভাবছি স্ত্রী, না, সন্তান, মানে—"

"এ কি রকম কথা, ভাই সাহেব ? স্ত্রী বাঁচলে তো সন্তান আবও হবে। কিন্তু স্ত্রী যদি মরে যায়—"

বাধা দিয়ে অম্বিকাবাবু বললেন, "না না, স্ত্রী কেন মবে যাবে! ডাক্তাব বললেন যে, স্ত্রী তো ভালই আছে। যদি মরে, তবে বাচ্চাটাই মরবে। মবাই উচিত।"

চমকে উঠলেন মিসেস বাজাজ। বাঙালীরা সব শিক্ষিত মানুষ বলেই তো তিনি জানতেন। যতদিন লাহোবে ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত বাঙালীদের সম্বন্ধে তাঁর খুব ভাল ধারণাই ছিল। কাছে এসে এ কি তিনি দেখছেন ? বাজাজ সাহেব তো রোজই বলেন যে, বাঙালীদের কথার কোন দাম নেই। কথার যদি দাম না থাকে, তা হলে তো মানুষটারও দাম রইল না। যে মানুষদের দাম নেই, তারা কি করবে ? তারা কবিতা কিংবা উপন্যাস লিখলেও তো দেশকে বড় করতে পারবে না। মিসেস বাজাজের মুখের দিকে চেয়ে অম্বিকাবাবু বুঝতে পারলেন যে, তাঁর কথা শুনে ভদ্রমহিলাটি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন। গ্র্যাণ্ট

স্ট্রীটে সমাজ না থাকতে পারে, মানুষ তো আছে। পাঞ্জাবিরা কি মানুষ নন? কেবল গাদা গাদা কবিতা-উপন্যাস লিখলেই মানুষ হওয়া যায় না, ভাবলেন অম্বিকাবাবু ভাবলেন বলেই তিনি বললেন, "আপনাকে দুঃখ দিলুম বলে খুবই লজ্জিত বোধ করছি। বাচ্চাটার একটা ইতিহাস আছে বলেই আমি বোধ হয় তার মৃত্যু-কামনা করেছিলাম।"

ফোল্‌ডিং খাটের ওপর বসে পড়লেন মিসেস বাজাজ। চুপ করে কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর বললেন, 'ইতিহাস যত খারাপই হোক না কেন, মানুষের কখনও মৃত্যু কামনা করতে নেই। মানুষের চেয়ে বড় দুনিয়ায় আর কি আছে, ভাই সাহেব? পাপ-পুণ্য মানুষেরই সৃষ্টি। ক্ষমা যদি না করতে পারলেন, তা হলে পুণ্যের তপস্যায় তো আপনার সিদ্ধি আসবে না। আমার বোনের কথা যদি শোনেন, তা হলে তো—না থাক্, বাংলা দেশকে আমরা এখনও চিনতে পারি নি।"

"গ্র্যান্ট স্ট্রীটে বসে বাংলা দেশকে চেনা যায় না।"

"কেন যায় না, ভাই সাহেব? আপনাকে দেখে বাংলা দেশকে চিনতে পারব না কেন? সমাজের চেয়ে মানুষ বড়— এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন? আমাদের পাঞ্জাবের পুরুষ মানুষরা এত বলিষ্ঠ যে, সমাজ কখনও তাদের মাথায় চাঁটি মারতে পারে না। ভাই সাহেব, আমার বোনকে যে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল সে কথা তো কাল আপনাকে বলেছিলাম।

দিল্লীতে যখন সে ফিরে এল তখন সে গর্ভবতী। বাচ্চাটাও বাঁচল না। আমাদের সমাজের সবাই ওর খবর জানত। —ভাই সাহেব।"

অম্বিকাবাবু মুখ নিচু করে গল্প শুনছিলেন। সামনের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি ফেললেন তিনি। মিসেস বাজাজের বোন দাঁড়িয়ে ছিলেন বাইরে। অম্বিকাবাবু বললেন, "আপনার বোন বোধ হয় আপনাকে ডাকছেন।"

বাইরের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "কি রে, সোহান এসেছে না কি?"

"হ্যাঁ।"—বাইরে থেকেই জবাব দিলেন মিসেস বাজাজের বোন।

"আচ্ছা, তুই যা, আমি আসছি।"—এই বলে মিসেস বাজাজ অম্বিকাবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "ভাবছেন, আমার বোনকে সেই জন্যে কেউ বিয়ে করে নি? না, ভাই সাহেব, এ ধারণা আপনার ভুল। ওকে বিয়ে করবার জন্যে এযাবৎকাল অনেক ছেলেই এগিয়ে এসেছিল। প্রত্যেকেই বড় বড় চাকরি করে। বোন নিজেই এতদিন বিয়ে করতে চায় নি। এবার সে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। সোহনের সঙ্গে কাল বিয়ে হবে—দিল্লীতে থাকতেই ওদের মধ্যে মহব্বত হয়। আপনাদের সমাজে আমার বোনকে নিয়ে আপনারা কি করতেন? ডাস্টবিনে ফেলে দিতেন নিশ্চয়ই?"

"ডাস্টবিনে?"—হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন অম্বিকাবাবু।

তারপর একটু হেসে তিনিই আবার বললেন, "না না। ডাস্টবিনে কি মানুষ থাকতে পারে? ওখানে সব ময়লা ফেলা হয়। বাংলার সমাজ তো ডাস্টবিন নয়। সোহন কি কাজ করে, বহীনজী?"

"দিল্লীতে কোন্ এক কলেজে যেন পড়ায়। প্রফেসর। বিলেত থেকে দু-তিনটে ডিগ্রী এনেছে। এখন চললুম। সোহনকে চা খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি পার্ক স্ট্রীটে। যাবেন নাকি সঙ্গে?"

"না না, নার্সিং-হোম থেকে যে-কোন মুহূর্তে খবর আসতে পারে। আমি তো খবরের জন্যেই সারাটা দিন ঘরে বসে আছি।"

"তা হলে এখন চলি, ভাই সাহেব। বাচ্চাটার ইতিহাস আমি পরে শুনব। সোহনের সঙ্গে আলাপ করবেন নাকি?"

"আজ থাক্, বিয়ের পরেই আলাপ করা যাবে। চাকরি পেলে আমিও হয়তো একদিন দিল্লী চলে যেতে পারি। মুরুব্বী নেই বলেই তো প্রাদেশিক সরকারের দরজায় কয়েকটা টাকার জন্যে মাথা কুটে মরছি। বাঙালী যদি একবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে, তা হলে দিল্লী আর গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটের মধ্যে তার কাছে কোন পার্থক্য থাকে না। আচ্ছা, আচ্ছা, নমস্তে।"

মিসেস বাজাজ হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। অম্বিকা গুপ্তর মুখে আর একবিন্দু হাসি নেই। গভীরভাবে সব কিছু উল্টেপাল্টে গোড়া থেকে ভাবতে লাগলেন তিনি।

অতসী আর তাঁর নিজের জীবনের ইতিহাসটাকে লুকিয়ে রাখবার জন্যে তিনি ফ্ল্যাট নিয়েছিলেন গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটে। তিনি জানতেন, এখানে লোকের ভিড় খুব বেশি, কিন্তু মানুষ নেই।

আজ তাঁর সেই পুরনো বিশ্বাসটা যেন আর টিকতে চাইছে না। গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটে মানুষের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। হয়তো এখানকার প্রতিটি ফ্ল্যাটে সত্যিকারের মানুষই বাস করে। অম্বিকাবাবু তাঁর পশ্চাৎ-ইতিহাস স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বালিগঞ্জের সেই বড় বাড়িটার মধ্যে কী সাংঘাতিক পরিস্থিতিরই না সৃষ্টি হয়েছিল! অমন সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়ির মধ্যে সেদিন একবিন্দু সভ্যতার সন্ধান পান নি।

রবিকরের সঙ্গে অম্বিকা গুপ্তর পরিচয় হয় কলেজ থেকে। অম্বিকাবাবু ছিলেন কলেজের সবচেয়ে ভাল ছেলে। রবিকর ছিল সবচেয়ে বড়লোকের ছেলে। সে কলেজে আসত মোটর গাড়িতে চেপে, আর অম্বিকাবাবু বউবাজার থেকে হেঁটে আসতেন প্রত্যেক দিন। অতএব রবিকরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হওয়ার কোন কারণই ছিল না। বন্ধুত্ব তবু হল। অম্বিকাবাবু যখন এম, এ, পড়তেন, তখন রবিকর একদিন তাঁব বউবাজারের মেসে এসে বলল, "চল্, তোকে আজ আমি অতসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।"

"অতসী কে রবি?"—জানতে চাইলেন অম্বিকাবাবু।

"আমার মাসতুতো বোন, ভিক্টোরিয়ার থার্ড ইয়ারে পড়ছে।"

"কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে কি করব ?"

"মেসোমশাই তোকে দেখতে চেয়েছেন। স্বরাষ্ট্র বিভাগের মস্তবড় অফিসার তিনি।"

"তোরা সব বড়লোক, আমি তোদের সমাজে গিয়ে ঠাঁই পাব না।"

সন্ধ্যের একটু পরেই অম্বিকাবাবু এলেন বালিগঞ্জের সেই বড় বাড়িটায়। রবিকরই নিয়ে এল। পরিচয় হল সুধীরবাবুর সঙ্গে, হল অতসীর সঙ্গেও। বালিগঞ্জের বিচিত্র এই সমাজের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে লাগল অম্বিকাবাবুর। অতসীদের ড্রইং-রুমে বসে তিনি মেহেরপুরের কথা ভুলতে লাগলেন ক্রমে ক্রমে। অতসীকে তিনি ভালবাসলেন। ভালবাসলেন বালিগঞ্জের এই বড় বাড়িটাকে।

প্রায়ই বিকেলবেলা অম্বিকাবাবু আসতেন অতসীদের বাড়িতে। মাঝে মাঝে অতসীর সঙ্গে দেখা হত না। বাড়ির চাকরদের কাছেই খবর পেতেন যে, সে রবিকরের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। ট্রামে চেপে আসা-যাওয়ার পয়সা নষ্ট হতে লাগল তাঁর। অতসীর মা বেঁচে নেই, অতসীর অনুপস্থিতিতে কার সঙ্গেই বা গল্প করবেন তিনি ?

কিছুদিন পরে এম,এ, পরীক্ষার সময় এসে গেল। অম্বিকাবাবু বালিগঞ্জ যাওয়ার আর সময় পেয়ে ওঠেন না। ভাল করে পাস না করতে পারলে বাবার কাছে গিয়ে কি জবাবদিহি করবেন ? কত আশা করে বুড়ো মেহেরপুরে বসে আছেন।

অম্বিকা তাঁর ভাল করে পাস করবে, বড় চাকরি পাবে সে। মেহেরপুরে বুড়োর আর থাকতে ভাল লাগছে না। অম্বিকার চাকরি হলেই তিনি ছেলের কাছে চলে আসবেন। মাঝে মাঝে বাবা অম্বিকাবাবুকে এই সব কথা লেখেন চিঠিতে। অম্বিকাবাবু তাঁকে চিঠি লিখে জাবাব দেন: আর কটা দিন অপেক্ষা কর, বাবা। পবীক্ষার ফল বেরুতে আব বেশি দিন বাকি নেই। মনে তো হয়, প্রথম শ্রেণীতেই পাস করব। পাস করার পরে চাকরি পেতে আর খুব বেশি দিন সময় নেবে না। নিজের কৃতিত্বেব জন্যে যদি বাংলা দেশে চাকবি না জোটে, তবুও আমার ভয় নেই। একজন মুরুব্বী পেয়েছি, বাবা। আমাদেরই স্বজাত। মস্ত বড় সরকারি চাকরি করেন তিনি। চাকরিব আমার অভাব হবে না।

চিঠি পেয়ে বুড়ো আবার চিঠি লেখেন অম্বিকাবাবুব কাছে: অম্বিকা, তোমাব চিঠি পড়ে খুবই সুখী হলুম। কলকাতার মত স্বার্থপর জায়গায় মুরুব্বী পাওয়া খুবই ভাগ্যের কথা। তোমার ফল বেরুতে আর ক'মাস লাগবে? চাকরি তুমি একটা পাবেই, অতএব এখন থেকেই একটা বাড়ির খোঁজ কর না কেন? মেহেরপুরের সবাই বলছে যে, কলকাতায় নাকি চাকরি পাওয়ার চেয়ে বাড়ি পাওয়া কঠিন।

চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অম্বিকাবাবু জবাব দেন: বাবা, তোমার চিঠি পেয়েছি। আমি একটা ফ্ল্যাটের সন্ধান করছি। দু-ঘরের ফ্ল্যাট হলেই আমাদের চলে যাবে। দক্ষিণ-খোলা

ফ্ল্যাট হলেই ভাল হয়। বুড়ো বয়সে তোমার গায়ে যদি হাওয়া না লাগে, তা হলে স্বাস্থ্য তোমার ভেঙে পড়বে।

এ চিঠি পেয়ে বুড়ো পুনরায় লিখলেন : তোমার চিঠি পেয়ে মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল। বাড়িতে না থেকে আমরা ফ্ল্যাটে থাকব কেন ? ফ্ল্যাট যে কি বস্তু আমি তা বুঝতে পারলুম না, অম্বিকা। গরিব লোকরাই বুঝি ফ্ল্যাটে থাকে ?

অম্বিকাবাবু লিখলেন : আজকাল শিক্ষিত লোকেরা সব ফ্ল্যাটেই থাকে, বাবা। ফ্ল্যাট মানে কি ? বাড়ির মধ্যে বাড়ি। একটা মস্তবড় বাড়ির মধ্যে আলাদা আলাদা অংশ। কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক থাকে না। বাইরের দিকের দরজা বন্ধ করে দিলে তোমার ফ্ল্যাট-ই একটা আলাদা বাড়ি। তেমন একটা ফ্ল্যাট খোঁজ করছি, পেয়ে গেলেই তোমায় জানাব। পরীক্ষার ফল বেরুতে আরও এক মাস বাকি।

ঠিক এই সময় হঠাৎ রবিকর এসে একদিন অম্বিকাবাবুর মেসে উপস্থিত হল। এসেই সে বলল, "কি রে অম্বিকা, বালিগঞ্জে যাওয়া যে ছেড়েই দিলি ? ব্যাপার কি ? পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, ঘরে বসে করিস কি সারাদিন ?

অম্বিকাবাবু বললেন, "করবার বিশেষ কিছু নেই বলেই ঘরে বসে থাকি। বালিগঞ্জ গেলে তো অতসীকে পাওয়া যায় না।"

"পাওয়া যায় না ?"—রবিকর যেন আকাশ থেকে পড়ল, "পাওয়া যায় না কেন, কোথায় সে যায় ?"

অম্বিকাবাবু বললেন, "কাল তো সন্ধ্যের সময় দেখলুম, অতসী চৌরঙ্গী পার হচ্ছে গাড়িতে—পাশে বসে তুই নিজেই তো গাড়ি চালাচ্ছিলি রবি।"

"ও, হ্যাঁ। আমাদের বাড়িতে অতসীর নেমন্তন্ন ছিল কাল। মা বললেন, অতসীকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে—যাক সে সব কথা। অতসী তোকে একবার আজ যেতে বলেছে।"

"আমি বোধ হয় মেহেবপুব চলে যাব বাবাব কাছে।"

"কেন ?"

"মেহেরপুরের জমিদার শশাঙ্ক চৌধুরী খুবই অসুস্থ। এবার এখানকার খরচ চলবে কি করে ?"

রবিকব একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বসল। তারপর অম্বিকাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সহানুভূতির সুবে সে বললে, "তোর কথা আমরা আগে থেকেই ভেবে বেখেছি। আসছে বছর অতসী বি, এ, পরীক্ষা দেবে। মেসোমশাই তাই বলছিলেন যে, অম্বিকা তো আর আমাদেব পর নয়, অতসীকে সে তো পড়াতে পারে রোজ। কাজটা নে না অম্বিকা। মাইনেটা অবশ্যি বড় কথা নয়।"

রোজই সন্ধ্যের সময় অম্বিকাবাবু আসেন বালিগঞ্জে অতসীকে পড়াতে। প্রায় মাসখানেক থেকে অতসী পড়ছে তাঁর কাছে। এই সময় একদিন এম, এ, পরীক্ষার ফল বেরুলো। অম্বিকা গুপ্ত প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাস করেছেন। সুধীরবাবু একদিন বললেন তাঁকে, "কি করবে

ভাবছ, অম্বিকা ? বিলিতী কোম্পানিতে চাকরি যদি কর, আমি তা হলে চেষ্টা করতে পারি।”

অম্বিকাবাবু বললেন, “না, আমি কলেজেই চাকরি নেব বলে ঠিক করেছি। চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছি, পরশু আমার ইন্‌টারভিউ আছে।”

প্রায় এক মাস পরে অতসীদেব বাড়িতে বিরাট এক নৈশ-ভোজের ব্যবস্থা হল। অম্বিকাবাবু প্রথম হয়ে পাস করেছেন বলেই অতসী এই ভোজেব ব্যবস্থা করেছে। সুধীরবাবু দুপুরের দিকে মেয়েকে একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “হ্যাঁরে অতসী, অম্বিকার বাবার কাছে কি আমি চিঠি লিখব ?”

“কেন বাবা ?”

“বিয়েব প্রস্তাব করব বলেই ভাবছি। রবি মেহেরপুরের ঠিকানাটা আমায় দিয়ে গেছে। তোদের বিয়ের জন্যে রবি বড্ড ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।”

“চিঠি এখন দিয়ো না, বাবা। আমি আজ ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে নিই।”

“হ্যাঁ, সন্ধ্যের সময় খবরটা আমায় দিস। আজ তা হলে সবার কাছেই খবরটা আমি ঘোষণা করে দেব।”

“ওঁকে এখনো আমি কিছু জিজ্ঞাসা করি নি, আজ আমি ওঁর সঙ্গে পাকা কথা কইব।”

সন্ধ্যের সময় অম্বিকাবাবু এলেন। বেশ একটু যত্ন নিয়ে

সেজে-গুজেই এসেছেন বলে মনে হল সুধীরবাবুর। বসবার ঘরে সুধীববাবু বসে ছিলেন। তিনি বললেন, "এখনো তো কেউ আসে নি, তুমি ববং ওপরে যাও।"

সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল অতসী। অতসীকে দেখে অম্বিকাবাবু অবাক হয়ে গেলেন। এমন একটা বিশেষ দিনে অতসী সাধাবণ একটা সাদা শাড়ি পরেছে। অতসী কি তা হলে তাঁব মনের কথা বুঝতে পাবে নি? আজ যে তিনি সবকাবীভাবে সুধীববাবুর কাছে বিযেব প্রস্তাব করবেন তেমন ইঙ্গিত তিনি তো কাল প্রকাশ কবেছিলেন অতসীব কাছে। ইঙ্গিত বলেই অতসী হযতো বুঝতে পাবে নি। অম্বিকাবাবু ধীবে ধীরে উঠে এলেন ওপবে। ওপবে এসে হাত বাখলেন অতসীর কাঁধে। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন দক্ষিণ দিকে, অতসীব শোবার ঘরে।

অম্বিকাবাবু বললেন, "তোমাব অনুমতি পেলে, তোমার বাবার কাছে আমি বিয়ের প্রস্তাব কবতে চাই আজ। তোমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রচুব, আমাব সেদিক দিয়ে কিছু নেই বলে তিনি কি এ বিয়েতে সম্মতি দেবেন না?"

"দেবেন। দেওযার জন্যে তিনি অস্থিব হয়ে উঠেছেন। কিন্তু—

"কিন্তু কি? থেমে গেলে কেন, অতসী?"—ব্যস্ততা প্রকাশ পেল অম্বিকা গুপ্তর প্রশ্নে। অতসী তবু মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল। অম্বিকাবাবু বুঝলেন, কোথায়

কি যেন বড় রকমের একটা গোলমাল বেধে গেছে। প্রতিদিনকার চেনা অতসীকে আজ যেন সহসা অচেনা বলে মনে হচ্ছে। সুধীরবাবুর আদর-পাওয়া একমাত্র সন্তান আজ যেন এই প্রথম গম্ভীর হতে শিখল। মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন অম্বিকাবাবু। অতসীকে তিনি ভালবাসেন। অতএব হাজার অপরাধও তিনি তার ক্ষমা করবেন। ভালবাসেন বলেই তো ক্ষমা করবার মত মনের গঠন তাঁর মহৎ হয়েছে।

"না না, এত বড় অপরাধ কি তুমি ক্ষমা করতে পার ?"—মাথা নিচু করেই প্রশ্ন করল অতসী।

"কি অপরাধ ? খুন করেছ নাকি ?"—জিজ্ঞাসা করলেন অম্বিকাবাবু।

এরই মধ্যে সুধীরবাবু নিচে থেকে লোক পাঠিয়েছেন দুবার। অম্বিকাবাবুকে ডাকছেন নিচে। কলেজ স্ট্রীটের কলেজ থেকে প্রধান অধ্যক্ষ এসেছেন। অন্যান্য অতিথিরাও সব এসে গেছেন। মেয়েব বিয়ের খবরটা ঘোষণা করবার জন্যে সুধীরবাবু খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অতসীই বা খবর দিচ্ছে না কেন ? সুধীরবাবু ভাবলেন, অম্বিকা কি অতসীকে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না ? স্বরাষ্ট্র বিভাগের এতবড় একজন অফিসারের মুখে করুণার হাসি ভেসে উঠল। কোথাকার কোন্ এক পল্লীগ্রামের অম্বিকা গুপ্তর সঙ্গে তিনি যে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন, সেই তো আশ্চর্যের কথা। অম্বিকার আবার মতামত আছে নাকি ? থাকলেও তার দাম

কিছু নেই। অম্বিকার মত একটা চুনোপুঁটিকে তো তিনি দুআঙুলেই টিপে মেরে ফেলতে পারেন। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সুধীরবাবু উঠে পড়লেন। অতিথিদের বললেন, "দেখি, খাবার ব্যবস্থা সব ঠিক হল কিনা।"

কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ডক্টর রায় জিজ্ঞাসা করলেন, "অম্বিকা গেল কোথায় ?"

"অম্বিকাকে আমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"—বললেন সুধীরবাবু।

ডক্টর রায হাসতে হাসতে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আজকেব এই নৈশ ভোজেব কারণটা কি, সুধীরবাবু ? অম্বিকা যে প্রথম হযে পাশ করেছে সে তো পুরনো হয়ে গেল। আসল ব্যাপারটা কি ?"

সুধীববাবু সহসা জবাব দিলেন না। কি জবাব দেবেন তাই ব্যেধ হয় মনে মনে ভাবলেন তিনি। অম্বিকা কিংবা অতসীর মতামতের জন্যে তাঁব কি দরকাব অপেক্ষা করবাব ? তিনিই তো পারেন ওদের হয়ে জবাবটা দিয়ে দিতে। তিনি ডক্টর রায়ের দিকে চেয়ে বললেন, "আপনাদের সামনে আজ আমি একটা বিশেষ খবর ঘোষণা করতে চাই। অম্বিকা গুপ্তর সঙ্গে অতসীর বিয়ে আমি ঠিক করে ফেলেছি।"

"দেখি দেখি, ওদের ডাকুন।"

"বেশ ভাল ম্যাচ হয়েছে।"

"কি বলেন দত্ত সাহেব, সম্বন্ধটা ভাল হয় নি ?"

"আরে, রেখে দিন ওসব পুরনো আমলের সামাজিক নিয়ম। বাপ ওর পাড়াগাঁয়ে থাকে বলে কি ওরা মানুষ না?"

"রবিকরের কাছে শুনেছিলুম, বিয়ের পরেই নাকি জামাই আর মেয়েকে বিলেত পাঠিয়ে দেবেন, সুধীরবাবু?"

শ্রীসুধীরকুমার দাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানা রকমের মন্তব্য শুনছিলেন। ভাল লাগছিল শুনতে। অম্বিকার প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে? ছেলেটা সারাজীবন প্রথম হয়ে পাস করেছে। গরীবের ঘরে জন্মেছে বলে তো সে কোন পাপ করে নি? সবাই তো 'সোনার চামচে' মুখে দিয়ে জন্মায় না, ভাবলেন সুধীরবাবু। তিনি আরও ভাবলেন যে, অম্বিকা ভাগ্যবান। জীবনের পরীক্ষায়ও অম্বিকা প্রথম হয়ে পাস করবে। অতসীর মত পয়লা নম্বর মেয়ে সে পেল—রূপে গুণে বালিগঞ্জে এমন কটা মেয়ে আছে যে অতসীর ওপর টেক্কা মারতে পারে? সুধীরবাবু বেরিয়ে এলেন বসবার ঘর থেকে। অম্বিকা এবং অতসীকে ডাকতে চললেন তিনি। মেয়ে এবং জামাই-গর্বে তাঁর যেন মাটিতে পা পড়তে চায় না। সিঁড়ির কাছে আসতেই সামনের দিকে চোখ পড়ল সুধীরবাবুর। দোতলার দেওয়ালের গায়ে অতসীর মায়ের একখানা ফোটো টাঙানো রয়েছে। ফোটোর উদ্দেশে তিনি যেন মনে মনে বললেন, "সত্তু, এর চেয়ে ভাল সম্বন্ধ তুমি নিজেও করতে পারতে না। তুমি আশীর্বাদ কর, অতসী যেন সুখী হয়।" সুধীরবাবু ওপরে উঠতে লাগলেন।

চোখের জলে অতসী বিছানার খানিকটা জায়গা ভিজিয়ে ফেলেছে। জীবনে সে মারাত্মক ভুল করেছে। কোটি কোটি মেয়ের মধ্যে কটা মেয়ে এমন ভুল করে? অতসীকে ভালবাসেন বলে ঈষৎ পূর্বে অম্বিকাবাবু বুক ফুলিয়ে কথা বলছিলেন। অতসী যদি খুন করেও থাকে, তবুও তাকে তিনি ক্ষমা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু অতসীর কথা শুনে অম্বিকা-বাবু পাথরের মত শক্ত হয়ে গেলেন। ক্ষমা করবার মত নরম অনুভূতি তাঁর একটুও রইল না। চরিত্রের বলিষ্ঠতা তাঁর গলা মোমের মত গ'লে যেতে লাগল। কেমন করে তিনি যুদ্ধ করবেন? অম্বিকাবাবুর প্রেম কি তবে সত্য নয়? অতসীর কথা শুনে এইটুকু সময়ের মধ্যেই অম্বিকাবাবু যেন তাকে ঘৃণা করতে লাগলেন। সবচেয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে অম্বিকাবাবু তাঁর সবটুকু শক্তিই হারিয়ে ফেললেন আজ।

অতসী উঠে এল বিছানা থেকে। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন অম্বিকাবাবু। কি যে করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। একগাছা সোনার হার তিনি গড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন অতসীর জন্যে। পকেট থেকে সেটা বার করবার সময় পেলেন না অম্বিকা গুপ্ত। অতসী এসে বসে পড়ল তাঁর পায়ের কাছে। ধীরে ধীরে সে বলতে লাগল, "আজ না হয় তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে না, কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন তুমি আমার সততায় বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে। আমায় সুযোগ দাও—"

"আজ আমি চলি।"—অতি ক্লান্ত সুরে বললেন অম্বিকাবাবু।

"আর তুমি আসবে না জানি। কিন্তু আমার কি উপায় হবে?"

"সে তো আমি বলতে পারব না। আমায় যেতে দাও।—" অম্বিকাবাবু এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। অম্বিকাবাবুর মনে হল, কি একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র চলেছে তাঁর চারদিকে। অতসীকে পড়াতে আসার ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। এমন একটা ব্যাপারের মধ্যে তাঁকে জড়াবার জন্যেই যেন রবিকর তাঁকে আমন্ত্রণ করে এনেছিল। এনেছিল সত্যি, ষড়যন্ত্রটাও হয়তো মিথ্যে নয়, কিন্তু তিনি তো তা সত্ত্বেও অতসীকে ভালবাসেন।

সুধীরবাবু দরজার ওপাশ থেকেই কথা বলতে বলতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, "তোমাদের বিয়ের খবরটা আমি সবার কাছে ঘোষণা করে এলাম, অম্বিকা। ও কি? ব্যাপার কি অতসী?"

অম্বিকা গুপ্ত দরজার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াতেই অতসী বলল, "ওঁকে যেতে দিয়ো না, বাবা। পালিয়ে যাচ্ছে—"

"কেন? ও কোথায় যাচ্ছে?"—জিজ্ঞাসা করলেন সুধীরবাবু।

"চলে যাচ্ছে, বিয়ে করতে চায় না।" ফস করে বলে ফেলল অতসী।

"না-ই বা করলে বিয়ে, তোকে বিয়ে করবার জন্যে লোকের অভাব হবে না কি ?"

"ওকে যে আমি ভালবাসি, আর—"

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন অম্বিকাবাবু। অতসীর সুরে সততার ধ্বনি। সুধীরবাবু মেয়ের দিকে চেয়ে ছিলেন। অতসী এবার সুধীরবাবুর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মুখ নিচু করে বলতে লাগল, "ওঁকে ছাড়া আমি যে আর কাউকে বিয়ে করতে পারি না। আমি যে মা হতে যাচ্ছি।" কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সুধীরবাবুর যেন মনে হল, তাঁর সংসার-সাম্রাজ্যের ওপর লক্ষ লক্ষ বোমা পড়ল—যেন সব ভেঙে চুরে একেবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কী অপূর্ব নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে কেবল অম্বিকাবাবুই কলঙ্কের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার ওপাশে। তারপর? সুধীরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সারা জীবনের পিতৃ স্নেহ এক মুহূর্তের মধ্যে বিষাক্ত হয়ে উঠল। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে সুধীরবাবু কেবল একটা কথাই সেদিন ব্যবহার করেছিলেন, অম্বিকাবাবুর তা আজও মনে আছে। কথাটা যেন কি ? "ব্রুট!" মনে পড়ল অম্বিকা গুপ্তর। আরও একটা কথা তাঁর আজও মনে পড়ে যে, সেদিনের সেই নৈশ-ভোজে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সবাই এসেছিল যোগ দিতে, আসে নি কেবল অতসীর মাসতুতো ভাই রবিকর।

সন্ধ্যে তো হয়ে এল, এখনো কোন খবর এল না নার্সিং হোম থেকে। অম্বিকাবাবু রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সমস্তটা দিন ঘরে বসেই কাটিয়ে দিলেন তিনি। কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

পার্ক স্ট্রীট থেকে মিসেস বাজাজ ফিরে এলেন। সঙ্গে সোহন সিংও আছেন। বিয়ে করবার জন্যে তিনি দিল্লী থেকে কলকাতা এসেছেন। রাস্তার ইলেক্ট্রিকের আলোয় সোহন সিংকে খুবই বলিষ্ঠ দেখাচ্ছিল। অম্বিকাবাবু মনে মনে খুবই তারিফ করলেন সোহন সিংকে। ভাঙতে সবাই পারে, কিন্তু জোড়া দিতে পারে কজন? মিসেস বাজাজের বোনের ভাঙা-জীবন জোড়া দিতে এসেছেন সোহন সিং।

অম্বিকাবাবুর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মেমসাহেবের ঘরের দিকে। মেমসাহেব আজ আর মুখে পাউডার মাখছেন না। প্রসাধনের কোন আড়ম্বর নেই তাঁর। অম্বিকাবাবু দেখলেন, খুব মনোযোগ দিয়ে কি একটা বই পড়ছেন তিনি। বাইবেল নয় তো? অম্বিকাবাবু ভেবেছিলেন যে, এই সব পাড়াগুলো কলকাতার ডাস্টবিন—নোংরা ফেলবার জায়গা। কিন্তু সে ধারণা তাঁর বদলে গেছে। বদলাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে।

অম্বিকাবাবুকে দেখতে পেয়ে মেমসাহেবটিও রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন অম্বিকাবাবুকে, "কি খবর গুপ্ত? বউয়ের খবর কি?"

"কোন খবর এখনো আসে নি। তোমার খবর কি মিস—?"

"মিস নয়, মিসেস—"

"বেশ তাই হল। তোমার বিছানাপত্র সব বাঁধা রয়েছে কেন ?"

মেমসাহেবটি ঘরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তারপর বললেন, "আমি আজ চলে যাচ্ছি। সে নিতে আসবে।"

"সে কে ? গল্পটা তো শোনালে না ?"—ঝুঁকে দাঁড়ালেন অম্বিকাবাবু। এই সময়ে বাজাজ সাহেবের বউ বাইরে থেকে ডাকতে লাগলেন, "ভাই সাহেব, ভাই সাহেব—

বোধ হয় নার্সিং-হোম থেকে খবর এসেছে, আমি চললুম। তোমার গল্পটা শোনবার লোভ রইল। এক্ষুনি চলে যাবে নাকি ?"

"যে-কোন মুহূর্তে সে আসতে পারে। গুড নাইট, গুপ্ত।"

বাজাজ সাহেবের ফ্ল্যাটে এসে টেলিফোন ধরলেন অম্বিকাবাবু। ডাক্তার সেন টেলিফোন করছেন,

"হ্যালো, কে ?"

"আমি অম্বিকা গুপ্ত।"

"সারাদিনে একবারও তো এলেন না ?"

"অপারেশন হয়ে গেছে নাকি ?"

"অপারেশন করতে হয় নি, ডেলিভারি হয়ে গেছে এমনিতেই —এ ডেড চাইল্ড।"

"খুন নয় তো ?"

"কি বললেন ?"

"অতসী কেমন আছে?" সামলে নিলেন অম্বিকাবাবু।

"একবার আসুন না। রাত এগারোটার মধ্যে যখন হয় একবার আসতে পারেন। আমি থাকব।"

"অতসী কেমন আছে, তা তো বললেন না?"

"তিনি ভাল আছেন। হ্যালো, ধরুন, আপনার শ্বশুর কথা বলছেন।"

অম্বিকাবাবু লাইনটা ধরে রেখেই বললেন, "হ্যালো?"

"কে? অম্বিকা?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ। বলুন, আমি শুনছি।"

"অম্বিকা, আমায় তুমি ক্ষমা কর।"

"হঠাৎ?"

"আমি ভুল বুঝেছিলাম, অম্বিকা। অতসীর কাছে আজ আমি সত্য ঘটনা সব শুনলুম। বালিগঞ্জের বাড়িতে একবার আসবে কি আজ?"

"কেন?"

"তোমার বাবা এসেছেন। হ্যালো, হ্যালো—"

"যাব। ছেড়ে দিলুম।"

রাত বোধ হয় তখন আটটাই হবে। অম্বিকাবাবু ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর গ্র্যান্ট স্ট্রীটের ফ্ল্যাটের ওপরে মায়া জন্মাল নাকি? অতসীর ট্রাঙ্ক আর সুটকেশগুলোতে সব তালা দেওয়া আছে কি না পরীক্ষা

করে দেখতে লাগলেন অম্বিকাবাবু। অতসী বোধ হয় বিয়ের পরে ট্রাঙ্কের তালাটা একদিনও খোলে নি।

দু-দশ মিনিটের মধ্যে অতসীর ঘরটা সাজানো হয়ে গেল। অম্বিকাবাবুর মনে পড়ল বিয়ের রাতটার কথা। সেই নতুন বিছানা, নতুন আসবাবপত্র সব যেন একই রকম রয়েছে। বালিগঞ্জের বাসরঘর গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটে এসেও পুরনো হয় নি। বিছানার ওপর হাতটা রাখতে গিয়ে অম্বিকাবাবুর যেন মনে হল, সারা বিছানাটা ঠাণ্ডা এবং ভেজা ভেজা। অতসী কি তবে সাতটা মাস এখানে কেবল কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে গেল? পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে অতসী। আর তাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? সোহন সিং যা পারেন, তিনি তা পারেন না কেন?

অম্বিকাবাবু বাইরে থেকে ঘরে তালা লাগিয়ে নেমে এলেন রাস্তায়। ট্রামে চেপে দক্ষিণ কলকাতায় যেতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হবে মনে করে তিনি ট্যাক্সি চেপে বসলেন। প্রায়শ্চিত্ত যা করবার তা তো করেছে অতসী।

অম্বিকাবাবু ট্যাক্সি থেকে নামলেন নার্সিং-হোমের সামনেই। শ্বশুর কিংবা ডাক্তার সেনকে তিনি দেখতে পেলেন না। একজন বেয়ারার কাছ থেকে অতসীর ঘরের নম্বর জেনে নিয়ে তিনি দোতলায় উঠতে লাগলেন। বিন্দুমাত্র দুর্বলতা অনুভব করলেন না অম্বিকা গুপ্ত। আজ তিনি আশাতীতভাবে বলিষ্ঠ হয়ে উঠলেন—ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষ আর রইল না তাঁর মনে। গ্র্যাণ্ট স্ট্রীট থেকে তিনি শক্তি সঞ্চয় করে এনেছেন। সোহন

সিংকে তিনি দেখে এসেছেন। অম্বিকাবাবু এইমাত্র দেখে এলেন যে মেমসাহেবটিও উঠে দাঁড়িয়েছেন। নর্দামার মানুষও হাত বাড়িয়েছে ওপরে উঠবার জন্যে।

অতসী শুয়ে ছিল, ঘুময় নি। অম্বিকাবাবু কখন যে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, অতসী তা টের পায় নি। অম্বিকাবাবু আরও একটু খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছ?"

"কে? তুমি?"—হাসবার চেষ্টা করল অতসী।

অম্বিকাবাবু একটু পরেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা এসেছেন, জান?"

"জানি।"—এই বলে অম্বিকাবাবুর দিকে হাত বাড়াল অতসী।

পূবদিকের জানলা দিয়ে প্রচুর জ্যোৎস্না এসে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। আজ বোধ হয় পূর্ণিমা।

অতসী অম্বিকাবাবুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "বড় আলোটা জ্বালিয়ে দাও না।"

"কেন, এই অল্প-আলোই তো ভাল।"—বললেন অম্বিকাবাবু।

"তোমাকে আমি ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। তোমার মুখটা অত শুকনো কেন? কাল থেকে বোধ হয় কিছুই খাওয়া হয় নি?"

অতসীর প্রশ্নের জবাব কিছু দিলেন না অম্বিকাবাবু। তিনি

বড় বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে এসে বসে পড়লেন অতসীর পাশে। অতসী তার স্বামীর পাঞ্জাবির কোণটা হাতের মুঠোতে ধরে বলল, "সাত মাস আগে এই পাঞ্জাবিটা পরে তুমি আমায় বিয়ে করতে গিয়েছিলে। মনে পড়ে ?"

মাথা নেড়ে অম্বিকাবাবু বললেন, "পড়ে।"

একটু পরে অতসীই আবার বলল, "সেদিন এই ধুতিটাও তুমি পরে এসেছিলে। ঠিক কি না বল ?"

"ঠিক।"—বললেন অম্বিকাবাবু।

"তোমার এই ধুতি আর পাঞ্জাবিটা আমার ট্রাঙ্কে বন্ধ করা ছিল। তুমি পেলে কি করে ?"

"তোমার ট্রাঙ্ক খুলে আজ আমি এগুলো বাব করে নিয়েছি।"

"আজকে বার কবলে কেন ?"

প্রশ্নটার জবাব দিলেন না অম্বিকাবাবু। পাঞ্জাবিব পকেট থেকে সরু একটা সোনাব হার বাব করে তিনি বললেন, "তোমার মনে পড়ে কি না জানি না, তোমাদের বাড়িতে একদিন রাত্রিতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম—"

কথাটা শেষ করবার আগেই অতসী বলে উঠল, "মাগো, কি কুৎসিত ছিল সেই রাতটা! কত বড় অপবাদ তোমার ঘাড়ে আমি চাপিয়ে দিয়েছিলাম সেদিন। অপবাদ দিয়েছিলাম বলেই তুমি বোধ হয় আমায় বিয়ে করেছিলে, না ?"

তিনি বললেন, "অতসী, সেই রাত্রে আমি তোমার জন্যে এই হারটা নিয়ে গিয়েছিলাম।"

অতসী মাথাটা হেলিয়ে দিল অম্বিকাবাবুর দিকে। কথা বলার প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি। হারটা অতসীর গলায় নিজে হাতে পরিয়ে দিলেন অম্বিকাবাবু। অতসী জিজ্ঞাসা করল, "সেদিনের সেই লগ্ন আজ ফিরে এল নাকি ?"

রাত সাড়ে নটার সময় অম্বিকাবাবু বেরিয়ে এলেন অতসীর ঘর থেকে। বাইরের রাস্তা থেকে বিরাট একটা হল্লার আওয়াজ এসে অতসীর ঘরে পৌঁছল। অতসী জিজ্ঞাসা করল, "এত হল্লা-চিৎকার কেন ?"

"বোধ হয় কেউ মোটর চাপা পড়েছে।"—বললেন অম্বিকাবাবু।

"আহা, একটু বাইরে গিয়ে দেখে এসো না—" অতসীর গলায় অনুরোধের সুর, "মরে যায় নি তো ?"

"দেখে আসছি।"

সিঁড়ি থেকেই অম্বিকাবাবু দেখলেন, নার্সিং-হোমের বারান্দায় ভিড় জমেছে। নার্সিং-হোমেরই লোক সব। নার্স ডাক্তার বেয়ারা সব এসে জড় হয়েছে বারান্দায়। অম্বিকাবাবুর শ্বশুর সুধীরবাবুও ছিলেন ভিড়ের মধ্যে। জামাইকে দেখতে পেয়ে সুধীরবাবু উঠে এসে দাঁড়ালেন অম্বিকাবাবুর পাশে। তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে তিনি বললেন, "অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। গেট দিয়ে যে রবিকর ঢুকছিল আগে তা আমি

লক্ষ্য করি নি। হাত থেকে হঠাৎ স্টিয়ারিংটা আমার ফসকে গেল। গাড়িটা ঘুরে গিয়ে পড়ল রবির ওপর।"

"বাঁচবার আশা আছে তো?"—প্রশ্ন করলেন অম্বিকাবাবু।

সুধীরবাবু কোন উত্তর দিলেন না। অম্বিকা গুপ্তর প্রশ্ন শুনে তিনি কেবল পাগলের মত হাসতে লাগলেন।

বৌবাজার আর শ্যামদত্ত রোডের জংশনে এখনো একটু অন্ধকার আছে। এই অংশটায় রোদ পড়ে না। আজকাল পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে সূর্য উঠছে বটে, কিন্তু সে তো বেলেঘাটার আকাশে আবদ্ধ হয়ে থাকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত। উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর এপাশ ওপাশ দিয়ে বৌবাজারের জংশনে এসে রোদ যখন পৌঁছয় তখন প্রায় সাতটা বাজে। সকাল সাতটা।

জংশনটার ঈষৎ দক্ষিণে তিনতলা বাড়িটাই হচ্ছে মানসী হোটেল। পরেশবাবুর হোটেল বললে শেয়ালদার কুলীরাও বাড়িটার ঠিকানা বলে দিতে পারে। এ অঞ্চলের সবচেয়ে চালু হোটেল এইটেই। সকাল সাতটার পরে পরেশ দত্ত তাঁর অফিস ঘরে এসে বসেন। অন্দরমহল থেকে অফিস ঘরের দূরত্ব পাঁচ ফুটের বেশি নয়, পরেশবাবুর তবু এই পথটুকু হেঁটে আসতে পনেরো মিনিট সময় লাগে। মোটা হয়ে পড়েছেন। মানুষের দেহ বলে আর চেনা যায় না। যেন মেদমজ্জার বড় বড় ঢেউ-গুলো তাঁর অস্থি-সৈকতে সর্বক্ষণ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কষ্ট পাচ্ছেন পরেশবাবু। মানসী হোটেলের মালিক কষ্ট পাচ্ছেন দেখলে একতলার এক নম্বর ঘরের পুরনো প্যাসেঞ্জার রামবাবু থেকে তিনতলার বিশ নম্বর ঘরের নতুন প্যাসেঞ্জার দাশু চক্কোত্তি

পর্যন্ত মনে মনে খুশি হন। রাঁধুনে বামুন, চাকর, দরওয়ান ইত্যাদি মিলিয়ে তাঁর মাইনে পাওয়া লোকের সংখ্যা বোধ হয় পঁচিশ জনের কম নয়। কিন্তু সবচেয়ে সিনিয়ার ভৃত্য বিধুভূষণ ছাড়া একটা লোকও পরেশবাবুর ওপর খুশি নয়। কষ্ট পাচ্ছেন পরেশবাবু। পাওয়াই উচিত। লোকটা শুধু অশিক্ষিত নয়, বর্বর এবং নিষ্ঠুরও। দোতলার সিঁড়ি থেকে লোকটা যদি একদিন পা ফসকে পড়ে যায়? বাইরে যাওয়ার সময় দাশু চক্কোত্তি প্রতিদিনই তিনতলা থেকে নেমে এসে দোতলার সিঁড়ির মুখে একটু দাঁড়ান। চেয়ে থাকেন নিচের দিকে। ধাপগুলো কেবল ছোট নয়, একেবারে খাড়া হয়ে উঠে এসেছে ওপর পর্যন্ত। লোকটা একদিন পা হড়কে এখান থেকে পড়ে যায় না কেন? মা কালীর কাছে প্রার্থনা করেও তো কোন ফল পাওয়া গেল না। এখন মা কালী যদি নিজে হাতে পরেশবাবুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন, তা হলেই শুভফল পাওয়া যেতে পারে। সারা বাড়িটায় এত আলো আর বাতাস, অথচ সিঁড়ি দুটোর জংশনে শুধু অন্ধকার আর...

সাতটা বাজলো। বৌবাজার আর শ্যামদত্ত রোডের জংশনে তবু অন্ধকার একটু লেগেই রইল। অফিসঘরের আরাম-কেদারায় বসে খুবই বিস্ময় বোধ করেন পরেশবাবু। এ-বিস্ময় তাঁর নতুন নয়, গত দশটা বছরের প্রতিটি মুহূর্ত যেন বিস্ময়ের অন্ধকারে আবৃত হয়ে আছে।

অফিসঘরে ঢুকে পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "বিধু, কটা বাজলো রে ?"

সিনিয়ার ভৃত্য বিধুভূষণ অফিসঘরের জানালা খুলতে খুলতে জবাব দিল, "সওয়া সাতটা।"

"সওয়া সাতটা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—সূয্যি এখন সরকারদের সোনা-কুঠীর ওপরে।"

"এখানে তবে আলো নেই কেন ?"

প্রতিদিনকার পুরনো প্রশ্ন শুনে বিধু একটু হাসে। হাসতে হাসতেই সে জবাব দেয়, "সূয্যি বোধ হয় কোটিপতিদের মায়া কাটাতে পারছে না। কাল রাত্তিরে তুমি তো বাবু বই লিখবার জন্যে ভেতরে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলে, এদিকে সাত নম্বরের ব্রজবাবু আর দশ নম্বরের শীতলবাবু হোটেলে ফিরলেন রাত এগারোটার পরে। তাঁরা বাইরে কোথায় নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছেন বলে আমাদের দুটো 'মিল' বেশি হল।"

"মিল দুটো তা হলে নিয়ে আয়।"

"বাসি জিনিস খেয়ে আর তোমার কাজ নেই।"

"বলিস কি বিধু, কাল না ছানার পায়েশ হয়েছিল ?"

"চর্বি আর বাড়িয়ো না বাবু।"

"চর্বি ? বিধু, তুই কি আমার দেহে শুধু চর্বি-ই দেখিস ?"

"কেবল আমি দেখব কেন, হোটেলের সবাই তো দেখছে। কদিন থেকে হাত দুটোও নাড়াতে পারছ না। বই লিখবে কি করে ?"

টেলিফোন বাজতে লাগল। বিধুভূষণ তাড়াতাড়ি টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে ধরল পরেশবাবুর কানের কাছে। নিজের হাতে রিসিভারটা কান পর্যন্ত টেনে তুলতে কষ্টই হয় তাঁর। আরাম-কেদারার দুদিকে হাত দুটো তাঁর ঘুমিয়ে পড়া বাদুড়ের মত ঝুলতে থাকে। দৃশ্য দেখে বিধুভূষণ মনে মনে হাসে। এই হাত দিয়েই না কি পরেশবাবু মানুষ খুন করবেন! তাও আবার একটা মানুষ নয়, দুটো মানুষের বুকে তিন ইঞ্চি চওড়া সাচ্চা ইস্পাতের ভোজালী বসিয়ে দেবার জন্যে বাবু নাকি অপেক্ষা করে বসে আছেন দশ বছর থেকে। একটা বাচ্চা ছেলে যা পারে পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসের পরেশবাবু তাও পারেন না। খেলনা পেলে হাসেন না, চিমটি কাটলে কাঁদেন না। বিধুভূষণের বিশ্বাস, গরম লোহা তাঁর গায়ের ওপর ঢেলে দিলেও তিনি ঠিক এমনি নির্বিকারভাবে আরামকেদারায় এলিয়ে বসে থাকবেন।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে বিধু জিজ্ঞাসা করল, "টেলিফোনে কথা কইল কে?"

"নাম জিজ্ঞাসা করি নি। হোটেলে ঘর পাওয়া যায় কি না খোঁজ করছিল।"

"কি বললে?"

"বললুম ঘব নেই। স্বামী-স্ত্রীর জন্যে আলাদা ঘর চাইছিল। হ্যাঁরে বিধু—"

"বাবু—"

"হাতটা একটু টেবিলের ওপর তুলে দে তো।"

"দিচ্ছি।" পরেশবাবুর ডান হাতটা সামনের চা-টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে বিধুই আবার বলল, "বিশ নম্বর ঘরটা তো খালি হবে।"

"সে তো সাতদিন থেকেই শুনে আসছি, কিন্তু—"

"দাশুবাবুর বৌ-টি নাকি অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি করবার জন্যে চক্কোত্তি মশাই এর মধ্যেই ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে ছুটো ভিজিট দিয়ে এসেছেন। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারি না —রোগী পড়ে বইল এখানে, আর ডাক্তাব তাঁর বাড়ি বসে ভিজিট নিচ্ছেন।"

"নইলে যে হাসপাতালে জায়গা পাওয়া যায় না। বিধু—"

"বাবু—"

"না, থাক। ছাখ্ তো বাইবে দাঁড়িয়ে কে?"

"আসতে পারি পবেশবাবু?" বলতে বলতে ভেতরে ঢুকলেন দাশু চক্কোত্তি। চায়ের টেবিলটা পরেশবাবুর হাঁটুর সঙ্গে ঠেকিয়ে দিয়ে বিধু বলল, "হাতটা ভোমার এখানেই থাক, চা নিয়ে আসছি।"

দশ বছর আগের লম্বা, ছিপছিপে সুপুরুষ পরেশ দত্তকে আজ আর কেউ দেখলে চিনতে পারে না। বনগাঁ থেকে কলকাভায় এসেছিলেন ব্যবসা করতে। হোটেল খুললেন। নাম দিলেন মানসী। প্রথমদিকে তিনি নিজেই গিয়ে দাঁড়িয়ে

থাকতেন শেয়ালদা স্টেশনে। হোটেলের নাম লেখা কার্ড হাতে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়াতেন দিন রাত। কয়েকদিন পরে বিধুভূষণ অনুমান করল, পরেশবাবু স্টেশনে যান কোন একটি বিশেষ লোকের অনুসন্ধান করবার জন্যে। অনুমান ওর মিথ্যে হয় নি। ক্রমে ক্রমে সব ঘটনাই ওর জানা হয়ে গেছে। জানিয়েছেন পরেশবাবু নিজেই।

আজ সন্ধ্যের পরেই পরেশবাবু অন্দর মহলে গিয়ে ঢুকলেন। হোটেলের সঙ্গে এই অংশটার কোন সম্পর্ক নেই। অফিস ঘরের পেছন দিকে দরজাটা বন্ধ করে দিলে অন্দরমহলটা হোটেল থেকে একেবারে আলাদা হয়ে যায়। বিধুভূষণ ছাড়া এদিকটায় কেউ আসতেও পারে না। সবার চোখে কৌতূহলের দৃষ্টি। সবার মনে প্রশ্ন ওঠে, "দত্ত বাবুর অন্দরমহলে কি আছে ?"

দুখানা ঘর। তার মধ্যে একখানা ঘর তো সারাদিন একরকম বন্ধই থাকে। একসময়ে ওটাই ছিল পরেশবাবুর শোবার ঘর। সারা ঘর জুড়ে খাট পাতা আছে। একটা নয়, দুটো। ঘরের মাপে খাট কিনলে এমনটা ঠিক হতো না। কিন্তু ঘর জোটবার আগেই তো খাট জুটলো তাঁর। কিনতে হয় নি, যৌতুক পেয়েছিলেন। কেষ্টনগর রাজবাড়ির পশ্চিম দিকের দেয়ালের দশহাত দূরেই তো ছিল তাঁর শ্বশুরবাড়ি। দশ বছর আগের সেই বিয়ের দিনটির কথা তিনি আজো মনে রেখেছেন। রাজবাড়ির উঁচু দেয়ালটার চেয়েও মাথা তাঁর উঁচু হয়ে উঠেছিল। রাজা বাদশার সঙ্গে পরেশবাবুর কোন সম্পর্ক ছিল না। তবুও

বিয়ে করতে বসে সোলার মুকুট-টা যেন মুহূর্তের মধ্যে রাজ-মুকুটের মত উঁচু হয়ে উঠেছিল। বিত্তহীন মধ্যবিত্ত-ঘরের মানুষ তিনি। আশেপাশে কত বিয়েই তো তিনি ঘটতে দেখেছেন। জন্মমৃত্যুর মত এটা কেবল স্বাভাবিক নয়, সাধারণ ব্যাপারও বটে। বিয়ের রাত্রির রোমাঞ্চ যে ক্ষয়ে এবং মুছে যেতে সাত-দিনও লাগে না, তাও তিনি জানতেন। অজ্ঞাত রহস্যের আয়ু যত দীর্ঘই হোক, ছ-সাত রাত্রির সীমানা পেরুলেই যে বিগত-রহস্যের গায়ে আয়ুহীনতার ছায়া পড়ে তেমন কথা তাঁর অবিদিত ছিল না। এত কথা জানার পরেও পরেশ দত্ত চেয়ে রয়েছেন পেছন দিকে। দশটা বছরেব সংখ্যাহীন মুহূর্তগুলোর মধ্যে একটা মুহূর্তও অস্পষ্ট নয়। ক্ষয় তো দূরের কথা, অবক্ষয়ের কিঞ্চিৎ কালিমা পর্যন্ত জমে উঠতে পাবে নি। বিধু তাঁব কতটুকু দেখেছে ? থল থলে চর্বি প্রধান দেহটা তাঁব সমগ্র অস্তিত্বের সিকি অংশও নয়। গায়ের চামড়ায় হাত বুলয় বলে হাতে ওর চর্বি ঠেকে, কিন্তু বিধু যদি তাঁব মনেব ওপব হাত বুলতে পারত, রাজমুকুটের স্পর্শ পেত সে।

দুখানা ঘব। শোবার ঘরটা ব্যবহার করেন না পরেশবাবু। এঘর থেকে ওঘরে হেঁটে যেতে কষ্ট হয় বলে নয়, ওঘরটার দরজায় সাইনবোর্ড টাঙিয়েছেন দত্তবাবু। কালো রংএর কাঠের ওপরে শাদা রং দিয়ে লেখা রয়েছে, মানসী মন্দির। বৌবাজারের ধুলো লেগে লেগে শাদা রং এখন মলিন হয়ে এসেছে। গোড়ার দিকে ধুলো জমতে পারত না। পরেশবাবু

নিজেই টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে প্রতিদিন ধুলো সাফ করতেন। এখন আর পারেন না। চলাফেরা করতে কষ্ট হয়। টার্কিশ তোয়ালের ওজন পর্যন্ত বহন করতে হাঁপিয়ে পড়েন তিনি।

সন্ধ্যের একটু পরেই আজ তিনি অন্দরমহলে চলে এলেন। বিধুও এল পেছনে পেছনে। চব্বিশ ঘণ্টাই পরেশবাবুর ওপর দৃষ্টি রাখতে হয় ওকে। সতর্ক থাকতে হয়। ধরে বসিয়ে দিতে হয় চেয়ারে। মুখের গ্রাস তুলে দেয় বিধুই।

চেয়ারে বসে পরেশবাবু বললেন, "কাগজ আর কলম বার কর্।"

মস্ত বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের কোন্ একটা ড্রয়ার থেকে বিধুভূষণ একগোছা কাগজ বার করল। একান্ন নম্বর পার্কার কলমটা পরেশবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করল, 'কতদূর এগুলে? রাণাঘাট জংশন কি পার হও নি বাবু?"

"না। এবার হবো। ভোজালীটা বার কর।"

আত্মজীবনী লিখতে বসেছেন পরেশ দত্ত। গত দশ বছরের মধ্যে দশ লাইনের বেশি তিনি লিখতে পারেন নি। রাণাঘাট জংশনটা কিছুতেই পার হতে পারছেন না। বর্ষাকাল। বৃষ্টি হচ্ছিল। গাড়ি বদলাতে হবে। প্ল্যাটফর্মে টিম টিম করে গোটা কয়েক আলো জ্বলছিল বটে, কিন্তু পুরো জংশনটার অন্ধকার তাতে কাটেনি।

ভোজালীটা হাতে তুলে নিয়ে পরেশবাবু বললেন, "শেষ পর্যন্ত অন্ধকারটুকুই আমার জীবনে সত্যি হয়ে রইল। বিধু,

ভোজালীর মুখে যা ধার আছে তা দিয়ে দুটোকেই একসঙ্গে সাফ করা যাবে। ওদের রক্ত ছাড়া জংশনের অন্ধকার তো দূর হবে না।" এই বলে পরেশবাবু ভোজালীটা আবার ফেলে রাখলেন টেবিলের ওপর। বিধুভূষণ বলল, "বাবু, তোমার দ্বারা আর বই লেখা হবে না। তুমি বরং দাশুবাবুকে দিয়ে বইটা লিখিয়ে নাও। শুনেছি, তিনি খুব বিদ্বান মানুষ। বোম্বাই না কোথায়, কলেজের মাস্টার ছিলেন।"

পরেশবাবু চুপ করে রইলেন। এ ঘরের জানলা দিয়ে বৌবাজার আর মহেন্দ্র দত্ত রোডের মোড়টা দেখা যায়। পরেশবাবু চেয়েছিলেন সেই দিকেই। সরকারদের সোনাকুঠীর আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর। জোড়া জোড়া স্বামী-স্ত্রী দোকানে ঢুকছেন অলংকার কিনতে। আনন্দের আলোয় প্রতিটি মুখ উজ্জ্বল। প্রসারিত জীবনের কোথাও যেন এঁদের বিষাদের ছায়া পড়ে নি। এমন দৃশ্য দেখতে ভাল লাগে পরেশবাবুর। একটু বাদেই জানলার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এসে তিনি বললেন, "এবার তুই যা বিধু, বইটা লিখতে শুরু করি।" বিধু চলে যাচ্ছিল, এমন সময় পরেশ-বাবুই আবার বললেন, "রাণাঘাট জংশনের অন্ধকার না ঘুচলে বই লেখা আমার শেষ হবে না।"

"অন্ধকার তোমার মনের জংশনে বাবু।"

"কি বললি?" একান্ন নম্বর পার্কার কলমটা গড়িয়ে পড়ল তাঁর হাত থেকে। পরেশবাবু দেখলেন, অন্দরমহলে

প্রবেশ করবার দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন দাশু চক্কোত্তি।

"আসতে পারি কি দত্ত মশাই ?" আমন্ত্রণের জন্যে তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। সোজা চলে এলেন পরেশবাবুর সামনে। বিধুভূষণ দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

মানসী হোটেলের দেয়াল-ঘড়িতে আট-টা বাজলো। রাত আট-টা। বৌবাজারের কোলাহল কমে এসেছে। সোনা-কুঠীর বড় ফটকটাও বন্ধ হয়ে গেল। পরেশবাবু চেয়েছিলেন দাশু চক্কোত্তির দিকে। কথা শুনছিলেন তাঁর। দাশুবাবু বলছিলেন, "সাতদিনের জন্যেই কলকাতা এসেছিলুম। পনেরো দিন হয়ে গেল : বৌ কাল হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন।"

"আপনি তো এখানেই থাকবেন ?" জিজ্ঞাসা করলেন পরেশ দত্ত।

"থাকতে পারলে ভালই হতো, কিন্তু থাকতে পারছি কই। ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। বোম্বে পৌঁছুতেও দুদিন লাগবে।"

"আপনার স্ত্রীকে দেখাশোনা করবেন কে ?"

"লোকের অভাব হবে না—আত্মীয়, স্বজন—মানে" কথাটা শেষ না করে দাশু চক্কোত্তি নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, "আপনি বিয়ে করেন নি দত্ত মশাই ?"

"করেছি।"

"তাই না কি ? কই মিসেস দত্তকে তো কোনদিনই দেখতে পাই নি ?"

"আমি নিজেই যে তাঁকে পুরো দুটো দিন দেখতে পাইনি।"

"ইন্টারেস্টিং! মানে—" দাশু চক্কোত্তি একটু নড়েচড়ে বসলেন, "দত্তবাবু বুঝি ধূমপান করেন না ?"

"না।"

বিধুভূষণকে ডাকতে হল। ডাকলেন দাশু চক্কোত্তি নিজেই। পকেটে হাত ঢুকিয়ে মণিব্যাগটা বার করতে গিয়ে তিনি হতাশার সুরে ঘোষণা করলেন, "এই যাঃ, মণিব্যাগটা বোধহয়—"

পরেশবাবু বললেন, "এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে আয় বিধু। কি সিগারেট খান ?"

"যে কোন ব্র্যাণ্ড। একটা গোটা টিন কেনাই ভাল। আমার জীবনে এটা একটা বিশেষ রজনী। গল্প হবে, সারারাত বসে গল্প হবে। আজকে আমাদের বিয়ের ঠিক দশম বর্ষ পূর্ণ হল। দত্তবাবু বুঝি নেশাটেশা করেন না ? আমার আবার স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুন আলাদা। না খেলে ঝরা-পাতার মত ফুর ফুর করে দেহটা উড়তে থাকে—ভাল আছেন মশাই, বিজ্ঞান তো চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছেন দেখছি। দেহটা কি আপনার গোড়া থেকেই এমন সাজানো-গোছানো ছিল ?"

বিধুভূষণ সিগারেটের টিনটা দাশুবাবুর সামনে রেখে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। টিন খুললেন দাশু চক্কোত্তি। সিগারেটে

ছতিনটে টান দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "মানসী-মন্দিরে কোন ঠাকুর-দেবতা আছেন না কি ? কাজটা কিন্তু ভাল করেন নি মশাই।"

"কোন্ কাজটা ?"

"বিধুর কাছে শুনছিলুম, আপনি না কি তপস্যা করছেন। একটা বৌ গেছে, অন্য একজনকে ঘরে আনতে পারতেন। আনাই উচিত ছিল। হাপিত্যেশ করে দশটা বছর বসে থাকার অর্থ কি ? তপস্যা করে কি পেতে চান ? আবার বিয়ে করে ফেলুন। বিধু বলছিল, আপনি না কি বই লিখছেন ? কি বই লিখছেন ? আমি মশাই বই পড়েছি অনেক, কিন্তু লিখি নি কিছুই।"

"আমি ঠিক আপনার উল্টো দাশুবাবু। পড়িনি কিছুই, কিন্তু বই লিখছি। লিখতুম না, যদি ভোজালীটার মুখ থেকে জবাব পেতুম।"

"ওটা বরং দূরেই সরিয়ে রাখুন। বই আপনার শোনান।"

কাগজগুলোব দিকে দৃষ্টি দিতে হল না। দশ বছরের চেষ্টায় যে ক-লাইন লেখা হয়েছে তা তো পরেশ বাবুর মুখস্থই আছে। তিনি বলতে লাগলেন, "কেষ্টনগর থেকে বিয়ে করে ফিরে আসছিলুম দেশে। রাণাঘাট জংশনে আমাদের গাড়ি বদলাতে হয়। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। মানসী গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল প্ল্যাটফর্মের এক কোনায়। জায়গাটা বেছে নিয়েছিল মানসী নিজেই। সারা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ওটাই

ছিল সবচেয়ে অন্ধকার জায়গা। গাড়ি থেকে জিনিসপত্র ঠিক মত নামলো কি না দেখবার জন্যে আমি বোধহয় খানিকটা দূরেই সরে গিয়েছিলুম। একটু বাদে ফিরে এসে দেখি, মানসী ওখানে নেই। শুধু সেই অন্ধকারটুকু সেখানে পড়ে আছে। ট্রেনের প্রতিটি কামরায় উঁকি দিয়ে দেখে এলুম, ওকে পাওয়া গেল না। রাণাঘাট জংশনের প্রতি ইঞ্চি জায়গা খুঁজে মরলুম সারা রাত ধরে—তারপর দীর্ঘ দশ বৎসর কেটে গেছে, মানসী ফিরে আসে নি।" দাশু চক্কোত্তি জিজ্ঞাসা করলেন, "আজো আপনি রানাঘাট স্টেশনে বসে বসে অপেক্ষা করছেন কেন ? একদিনের বিয়ে কি বিয়ে নাকি ?"

"বোধহয় অপেক্ষা করছি, এই প্রশ্নটারই জবাব খোঁজবার জন্যে।"

"সত্যি জবাব আপনি পাবেন না, যতদিন না আপনার মনের জংশন থেকে এই অন্ধকারটুকু লোপ পায়। মানসী যে অন্য কাউকে ভালবাসত তা তো আপনি বুঝতেই পারছেন।"

"তবুও বিয়ের-সত্য আমি অস্বীকার করতে পারছি না। দাশুবাবু, সবাই বলে আমি মূর্খ, আমি বর্বর। মানসী ছাপ দেওয়া একটা অস্পষ্ট নারী-দেহ শুধু একটা রাত্রির জন্যে আমার কাছে এসেছিল",—

বাধা দিয়ে দাশু বাবু বললেন, "আমি হলে মানসীর অস্তিত্ব অস্বীকার করতুম। অস্পষ্ট একটা নারী-দেহের স্বামী হওয়ার মধ্যে আর যাই থাক, স্বামীত্ব কিছু নেই।"

"তবুও আমি যে মানসীর স্বামী সে কথা ভুলতে পারছি নে। ভোলবার একটা মাত্র পথ আছে—"

"কি পথ ?"

ভোজালীটা হাত দিয়ে চেপে ধরে পরেশ বাবু বললেন, "মানসীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।"

"মানসী যদি ফিরে আসে, যদি সে অনুতপ্ত হয় ?"

পরেশ বাবু এতক্ষণ বোধ হয় চোখ বুজে কথা বলছিলেন। চোখ খুলে এবার দাশু চক্কোত্তির প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি দেখলেন, দাশু বাবু নেই। তিনি কখন্ যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন পরেশ বাবু তা টের পান নি। দাশু চক্কোত্তি কখন্ এলেন আর কখন্ যে চলে গেলেন ভেবে খুবই বিস্মিত বোধ করতে লাগলেন তিনি! সত্যিই কি দাশু বাবু এসেছিলেন ? না এলে এতক্ষণ কথা বলছিলেন কার সঙ্গে ?

দেয়াল ঘড়ির দিকে চেয়ে পরেশবাবু আরও বেশি অবাক হয়ে গেলেন। এত রাত পর্যন্ত এখানে বসে তিনি কি করছিলেন ? রাত প্রায় দুটো বাজে। দশবছর আগের সেই রাণাঘাট স্টেশনের রাতটি যেন আবার ফিরে এসেছে মানসী হোটেলের এই নির্জন অংশটায়। আকস্মিক সাদৃশ্যটা স্পষ্ট হওয়ার পরে পরেশবাবু খুঁজতে লাগলেন মানসীকে। অন্ধকার অপসারিত হওয়ার আগে মানসীর শেষ তিনি দেখতে চান।

ভোজালীটা ধরতে গেলেন পরেশ বাবু। ভোজালী নেই। দাশু বাবু বোধহয় যাওয়ার সময় অস্ত্রটা নিয়ে গেছেন।

অস্ত্রহীন পরেশ দত্ত অসহায় বোধ করতে লাগলেন। আত্মজীবনীর কয়েকটা দুর্বল লাইন পড়ে আছে টেবিলের ওপর। মুখে তাদের ধার নেই—ইস্পাতের সামর্থ্য দিয়ে একটা অক্ষরও তিনি গড়ে তুলতে পারেন নি। তিনি যে মানসীর স্বামী তেমন সত্যটা প্রতিষ্ঠিত করবার পথ পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন পরেশ দত্ত। ঘরটা অন্ধকার হল, এ অন্ধকার তাঁর ঘরের না বিবেকের, সঠিক করে কিছু বোঝবার আগে তিনি দেখলেন, মানসীমন্দিরের দরজা খোলা।

থলথলে মাংসপিণ্ডের মধ্যে অকস্মাৎ কোথা থেকে শক্তির জোয়াব এল। চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন তিনি। এগিয়ে গেলেন মানসীমন্দিরের দিকে। ঘরে আলো জ্বলছে। জোড়া খাটের বার্নিশ দশ বছর পরেও এতটুকু ম্লান হয়নি। বিয়ের খাট। খাটের ওপরে বিছানা পাতা রয়েছে। পরেশ বাবু বিছানার ওপর হাত রাখলেন। দশ বছর আগেকার সেই বলিষ্ঠ হাত দিয়ে খুঁজতে লাগলেন নারী দেহ। মন্দিরের পবিত্রতা লোপ পেয়েছে। অতৃপ্ত কামনার উত্তপ্ত নিশ্বাসে পবিত্রতার ধূপ দগ্ধ হচ্ছে। দগ্ধ হচ্ছিল গত দশ বছর থেকেই। পলাতকা মানসীর স্বামী হওয়ার সৌভাগ্য দিয়ে এ-মন্দির তিনি গড়েন নি। এ-মন্দির কামনার। তাঁর অচেতন মনের আবদ্ধ ঘরে মানসী-দেহের নৈবিদ্য নষ্ট হচ্ছিল নিষ্ফল-পূজায়। নিজেকে

তিনি ভুল বুঝিয়েছেন। অনুষ্ঠানের মন্ত্র তিনি উচ্চারণ করেছিলেন বটে, কিন্তু জীবনের চেয়ে মন্ত্র যে বড় নয় তেমন সত্য তিনি এযাবৎকাল স্বীকার করেন নি।

ঘুরে দাঁড়ালেন পরেশ বাবু। খোলা দরজার মাঝখানে ঈষৎ অন্ধকার। মানসী দাঁড়িয়েছিল ওইখানেই। পরেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি? তুমি কোত্থেকে এলে?

"তিন তলার বিশ নম্বর ঘর থেকে।"

"কি চাও তুমি?"

"ঐ বিছানাটায় শুতে চাই।"

"এটা মন্দির।"

মানসী হেসে উঠল। পরেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "হাসছো যে?"

"আমাকে বাদ্ দিয়ে তুমি তো মন্দির গড়তে পার নি। গল্পটা একটু শুনবে?"

"প্রায় ভোর হয়ে এল—যা বলবার তাড়াতাড়ি বলো। বিধু এসে উপস্থিত হতে পারে।"

"আসুক না বিধু, এতে লজ্জার কি আছে? আমি তো তোমার স্ত্রী।"

এবার পরেশ বাবুও হেসে উঠলেন। মানসী জিজ্ঞাসা করল, "হাসছো যে?"

"তোমাকে আমি চিনি না।"

"বলো কি ? সেই যে বিয়ের পরের দিন রাণাঘাট জংশন থেকে আমি পালিয়ে গেলুম !"

"মিথ্যে কথা, আমার মানসীকে আমি পালিয়ে যেতে দিই নি। এই মন্দিরটা তার সাক্ষী।"

"দেহ ছাড়া প্রেমের কোন মূল্য নেই। আমি এবার তোমার কাছে ফিরে আসতে চাই।"

"কেন যার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলে তার কি হল ?"

"সে আমার দেহটাই চেয়েছিল, প্রেম চায় নি। আমি অসুস্থ।"

"অসুস্থ ?"

"হ্যাঁ—লোকটা এত বেশি বিদ্বান যে দশ বছরের মধ্যেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়লুম। সে বই এব পাতায় প্রেমের ব্যাখ্যা খুঁজতো, জীবন নয়—বিছানাটা বুঝি দশ বছরের মধ্যে একবারও ব্যবহার করো নি ? আমি এবার শোব। দেখছো না, আমার পা কাঁপছে ?"

"আমার এখানে আসতে তোমার ভয় করল না ?"

"না।"

"দাশুবাবু আমার অস্ত্রটা নিয়ে গেছেন বলে বুঝি ?"

"তোমার আসল অস্ত্রটা দেখতে পেয়েছি বলে ভয় আমার কেটে গেছে। তোমার আসল অস্ত্র তো প্রেম।"

"মানসী।"

পরেশ বাবুর থল থলে দেহটা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

তিনি হাত বাড়ালেন মানসীর দিকে। অতি সাধারণ একজন মানুষ হয়েও নিজেকে অসাধারণ বলে ভাবতে লাগলেন তিনি। সামনে আর অন্ধকার নেই। দৃষ্টি স্বচ্ছ। পরেশ বাবু দেখলেন, খোলা দরজার মাঝখান থেকে মানসীও অন্তর্হিত হয়েছে।

ওপাশের ওই জানলা দিয়ে ভোরের আলো ঢুকে পড়েছে ঘরে। পরেশবাবু এগিয়ে গেলেন সেই দিকে। সূর্য উঠতে এখনও একটু বিলম্ব আছে। বেলেঘাটার আকাশে আজ হয়তো সূর্য আর আবদ্ধ হয়ে থাকবে না। বেলেঘাটার উঁচু উঁচু বাড়িগুলো রুখতে পারবে না প্রভাতের এই নতুন আলো। সরকারদের সোনাকুঠীর চেয়েও পরেশ বাবুর মনের কুঠী আজ উচ্চতর। শুধু উচ্চতর নয়, উজ্জ্বলতরও বটে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে পরেশ বাবু দেখলেন, রাণাঘাট জংশনের অন্ধকার আপাতত অপসারিত হয়েছে।

সিনিয়র ভৃত্য বিধুভূষণ ছুটে এল পরেশবাবুর কাছে। এসে বললে, "চক্কোত্তি মশাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"কোথায় গেলেন তিনি?" পরেশ বাবুর সুরেও বিস্ময়ের আভাস।

"কাল রাত্তিরে তিনি তো তোমার সঙ্গেই গল্প করছিলেন। তিনি কি তোমায় কিছু বলে গেছেন বাবু?"

জানলার ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন পরেশ দত্ত। বিধুভূষণের প্রশ্নের কি জবাব দেবেন তিনি? দাশু চক্কোত্তি কি শুধু কাল

রাত্রিতেই প্রথম তাঁর অন্দর মহলে ঢুকেছিলেন? বোধ হয় না। দশ বছর আগে রাণাঘাট জংশনের রাতটা তিনি ভুলবেন কি করে? প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারটুকুই তো ছিল দাশু চক্কোত্তি। এ-অন্ধকারের মৃত্যু নেই।

পরেশ বাবু চুপ করে আছেন দেখে বিধুভূষণ পুনরায় বলল, "অসুস্থ বৌকেই শুধু ফেলে গেছেন হোটেলে। বাবু, চক্কোত্তি মশাই তাঁর জিনিস পত্র নিয়ে সরে পড়েছেন। তিনি কি তাঁর বিলের টাকা সব শোধ দিয়ে যান নি?"

"অন্ধকারের ঋণ কখনো শোধ হয় না বিধু। চল্ তো, বিশ নম্বর ঘরটা একবার দেখে আসি।"

"ওপরে উঠতে তোমার কষ্ট হবে না?"

"না—ওপরে উঠতে আর আমার কষ্ট হবে না।"

অবাক হয়ে বিধুভূষণ চলতে লাগল পরেশ বাবুর পিছু পিছু।

নবনীতার লাঞ্ছনা

অপেক্ষা করবার আর দরকার নেই। আসছে মাসের যে-কোন একটা তারিখ দেখে নবনীতার বিয়ে দেওয়াই উচিত। এখন এটা বৈশাখ চলছে। বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে নবনীতা। ফল বেরুতে দেরি হবে। দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে শৈলেশ সেন মনে মনে একটা হিসেবও করে ফেললেন। হ্যাঁ, প্রায় মাস তিনেক দেরি তো হবেই। নবনীতার বাবা হচ্ছেন শৈলেশবাবু। মনোবিজ্ঞানের পি-এইচ-ডি। কলকাতার বড় একটা কলেজের অধ্যাপক তিনি।

নবনীতার মা রমা দেবী সামনেই বসে ছিলেন। আজ রবিবার। রান্নাবান্নার এমন কিছু তাড়া নেই। তা ছাড়া ঠাকুর এখনো বাজার থেকে সওদা নিয়ে ফিরেও আসে নি। অতএব ঘুম থেকে উঠে রমা দেবী চা খাচ্ছেন আর নবনীতার বিয়ের আলোচনাও শুনছেন। সময়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার দরকার হচ্ছে না। তিনি অবশ্য দেখতে পেয়েছিলেন যে, শৈলেশবাবুর হাতে একখানা চিঠি রয়েছে। খোলা চিঠি আর বেশ লম্বাও। চিঠিখানা যে খুবই জরুরী রমা দেবীর বুঝতে আর তা বাকী নেই। এইটুকু বোঝবার জন্যে তাঁকে মনোবিজ্ঞানের ডিগ্রী নিতে হয় নি।

শৈলেশবাবু আলোচনা চালু করলেন। নবনীতাকে চাকরি

করতে হবে না। নিছক জ্ঞান অর্জনের জন্যেই মেয়েকে তিনি লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। ইচ্ছে থাকলে বিয়ের পরেও সে ঘরে বসে গাদা গাদা বই পড়তে পারে। অতএব পরীক্ষার ফল বেরয় নি বলে বিয়ে বন্ধ থাকবে কেন?

টি-পট্ থেকে দ্বিতীয় পেয়ালা চা ঢাললেন রমা দেবী। চামচে দিয়ে চায়ের সঙ্গে চিনি মেশাতে গিয়ে টং করে একটা আওয়াজ হল। শৈলেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু ভাঙলো নাকি?" "না, বিলিত পেয়ালা অত ঠুনকো নয়।" জবাব দিলেন নবনীতার মা।

খোলা চিঠিখানা হাতে নিয়ে শৈলেশবাবু এবার কাজের কথা বলতে লাগলেন। নিরঞ্জন আর ঠিক সাত দিন পরে বিলেত থেকে ফিরে আসবে। লণ্ডন থেকে সোজা ফ্লাই করছে সে। কাইরো এয়ার-পোর্টে নামবার দরকার হবে না। বি-এ-ও-সি'র উড়োজাহাজ সব আলাদা পথে আসছে। মধ্যপ্রাচ্যের সবটা আকাশই নিরাপদ নয়। সুয়েজ খালের গণ্ডগোল আপাতত মিটে গেছে বটে, কিন্তু পূর্বের আকাশে এখনো বারুদের গন্ধ ভাসছে। নিরঞ্জন ঠিকই করেছে। বেশি ভাড়ার টিকিট কেটে সে বি-এ-ও-সি'তে আসছে। সোজা নামবে এসে দমদমের বিমানঘাঁটিতে। শৈলেশবাবু যদি রমা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে দমদমে যান নিরঞ্জনকে অভ্যর্থনা জানাতে তা হলে কি রমা দেবীর আপত্তি আছে? আপত্তি থাকা উচিত নয়, বললেন শৈলেশবাবু। তা ছাড়া নিরঞ্জনের বাবা

নির্মল গুপ্ত মশায়ের কাছ থেকে শৈলেশবাবু কাল বিকেলের ডাকে একটা জরুরী চিঠিও পেয়েছেন। নবনীতাকে পছন্দ করেছেন খুব। অমন মেয়েকে অপছন্দ করবার মত ধৃষ্টতা তাঁর নেই। দানসামগ্রীর কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। শৈলেশবাবুর একমাত্র সন্তান নবনীতা। তিনি স্বইচ্ছায় যা দিতে চান তাই তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবেন। দাবি কিছুই নেই। তবে একটা কথা নির্মল গুপ্ত প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। নিরঞ্জন বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিলেত থেকে ফিরছে। চাকরিও তার ঠিক হয়ে আছে। শুরুতেই সে সাড়ে সাত শো করে পাবে। পাকা নিয়োগপত্র সে পকেটে নিয়ে আসবে। ভাল চাকরি। দুর্গাপুরে ইস্পাতের কারখানায় পাঁচজন বড় চাকুরের মধ্যে সেও একজন। নিরঞ্জন ভারতবর্ষের নগণ্য একজন নাগরিক নয়। ইস্পাত প্রস্তুতের যাবতীয় কলাকৌশলের বিশেষজ্ঞ সে। বেদ-বেদান্তের ভারতবর্ষের গল্প বলে আমায় আর লজ্জা দেবেন না, সেনমশাই। পৌনে দুশো বছর ধরে বেদ-বেদান্তের ইংরেজী অনুবাদ আমরা কিছু কম পড়িনি। ইংরেজরা আমাদের ভাঁওতা দিয়ে রেখেছিল। ওরা বিদেয় হওয়ার পরে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ ইংরেজ বণিকদের ভাঁওতা সব ধরে ফেলেছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন ইস্পাত ছাড়া এদেশ কখনই খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। মোদ্দা কথা, ইস্পাত মানেই সভ্যতা। নিরঞ্জন সেই সভ্যতার প্রতিনিধি হয়ে সতেরই বৈশাখ, ইংরেজী

২রা মে, দমদমের বিমান-ঘাঁটিতে অবতরণ করবে। অতএব তার পদমর্যাদার দিকে দৃষ্টি রেখে শৈলেশবাবু যা-কিছু দিতে চান তাই তিনি সরলমনে নিয়ে আসবেন। বিয়ের খরচা বাবদ পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম পেলে তিনি এখনই বিয়ের তারিখটাও স্থির করে ফেলতে চান। নিরঞ্জন প্রগতিশীল যুবক। যৌতুক হিসেবে নগদ টাকা নেওয়ার ঘোর বিরোধী সে। কলকাতায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জনের একটা মোটর-গাড়ি দরকার। বাঙালী বাবুদের মত হাওয়া খাওয়ার জন্যে সে মোটার-গাড়ি চায় না। দুর্গাপুর থেকে সপ্তাহ-শেষে নিরঞ্জন বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা আসবে পিতা-মাতা এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার জন্যে। সামাজিকতা বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তার একটা গাড়ি চাই। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ি হলে চলবে না। কলকাতা থেকে দুর্গাপুরের দূরত্ব একশো মাইলেরও বেশি। যাতায়াতে দুশোর ওপরে। সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়িতে মাঝপথে বিপদ ঘটতে পারে। অতএব, একটা নতুন গাড়িরও যোগাড় রাখতে হবে সতেরোই বৈশাখের আগে। বড গাড়ি আপনি দেবেন না, শৈলেশবাবু। দশ থেকে চৌদ্দ অশ্বশক্তির গাড়ি দিলেই কাজ চলবে। আজকে সন্ধ্যের মধ্যেই আপনার স্বীকৃতি জানাবার ব্যবস্থা করবেন। আমি রাত দশটা পর্যন্ত বাড়ি থাকব। হাতে সময় খুব বেশি নেই। তাছাড়া আরও শ-খানিক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা নিরঞ্জনকে জামাই করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে আছেন। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা নবনীতাকেই

পুত্রবধূ করে ঘরে তুলে আনি। ওর ফোটোখানা নিরঞ্জনের কাছে পাঠিয়েছিলাম। ফোটো দেখে সে শুধু নবনীতাকে পছন্দই করে নি, সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের সম্মতিও জানিয়েছে। অত্র মঙ্গল। ইতি—

এতটা শোনবার পরে : রমা দেবী চুপ করে বসে রইলেন। শৈলেশবাবু আব ধৈর্য ধরতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি বলো? সবই তো শুনলে।"

"দেখি, নবনীতাকে জিজ্ঞাসা করি।" বললেন রমা দেবী।

"কেন, সে কি বিয়ে করতে চায় না?"

"তবু একবার জিজ্ঞাসা করা ভাল।" রমা দেবী উঠলেন এবং তিনিই আবার বললেন, "মেয়ে শুধু বড় হয় নি, লেখাপড়াও শিখেছে—"

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে শৈলেশবাবু বললেন, "বাংলা দেশের খবর আমি রাখি। তিনশো টাকার ওপরে মাইনে পাওয়া বাঙালী ছেলের-সংখ্যা কাগজ পেন্সিল ছাড়াই আমি গুনে বলে দিতে পারি। বড় চাকরির প্রতিযোগিতায় এরা পেরে উঠছে না। নিরঞ্জনের মত ছেলে যদি ফসকে যায় তা হলে আমায় মাদ্রাজ কিংবা মাদ্রাজী পাড়ায় যেতে হবে পাত্র খুঁজতে। আমি নিজেওতো বিশ বছর চাকরি করার পর সাড়ে সাতশো টাকা মাইনে পাইনে। মনোবিজ্ঞানের নোট বইগুলো এত বেশি চালু না থাকলে নবনীতার বিয়েতে ত্রিশ হাজার টাকা খরচই বা করতুম কি করে?"

রমা দেবী বললেন, "নবনীতার মত তবু নিতেই হবে। তুমি তো মনোবিজ্ঞানের পি-এইচ. ডি—"

"না, না, নীতা সেরকম মেয়েই নয়," চঞ্চল হয়ে উঠলেন শৈলেশবাবু, "নীতাকে আমি জানি। দুচারখানা বাংলা-উপন্যাস আজকাল সে পড়ছে বটে, কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই।"

"নিজের মেয়ে বলেই তুমি এতটা নিশ্চিন্ত বোধ করছ। যাক, ওর যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে তুমি একবার নির্মল-বাবুর বাড়ি, পাম এ্যাভিনু থেকে ঘুরে এসো।"

রমা দেবী চললেন নবনীতার ঘরে।

নবনীতার শয্যাত্যাগ করতে দেরি হল আজ। এই তো সবে বি-এ পরীক্ষা শেষ হয়েছে। রাত জেগে জেগে বই মুখস্থ করতে হয়েছে ওকে। নবনীতা ভাবে, পরীক্ষা পাসের নিয়মটা কত সহজ। দুটো বছর কাউকে পড়তে হয় না, শুধু দুটো মাস রাত জেগে বই মুখস্থ করতে হয়।

নটা বেজে গেছে। সকালের প্রথম ডাকও এসে পৌঁছল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, নবনীতার নামে চিঠি এসেছে একটা। বিছানায় শুয়েই নবনীতা দেখল, খামের বাঁ দিকে এয়ারমেলের লেবেল লাগানো রয়েছে। বিদেশ থেকে উড়ো জাহাজে চেপে চিঠিখানি ওর কাছে এসে পৌঁছেছে। হাতের

তালুতে অজানা-রহস্যের তাপ লাগল ওর। লাগাতে চাইল ও নিজেই।

শয্যাত্যাগ করল নবনীতা। দিনটা আজ ভাল কাটবে। উনিশ বছরের একটানা একঘেয়েমির স্রোত নতুন ভূ-খণ্ডের দিকে বাঁক নিয়েছে। হয়তো বা অজানা-আকাশের বলাকা আজ ঢুকেই পড়ল বায়ান্ন নম্বর বাড়িটার দুতলার ঘরে। বড় আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াল নবনীতা। উনীশ বছরের স্বাস্থ্যের গায়ে মনোবিজ্ঞানের রামধনু। পৃথিবীর ওপর থেকে যেন প্লাবনের জল সব নেমে গেল। নোয়ার নৌকোটি এবার আরাবত পর্বতের চূড়ায় এসে ঠেকেছে। নতুন মাটির সন্ধান নিয়ে পায়রাটা বোধ হয় ফিরেও এল। ঠোঁটের ফাঁকে ওর জলপাই গাছের নব-কিশলয়।

হ্যাঁ, এমনটাই ও চেয়েছিল। স্বাস্থ্যের প্লাবনে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ও ভেসে থাকতে চায় নি। ভালবাসতে চেয়েছিল নবনীতা। প্রত্যাখ্যানের লাঞ্ছনায় সর্বাঙ্গ ওর ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠুক, তেমন প্রার্থনাও ওর মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। প্রিয়তমের কাছে পৌঁছতে হলে যে সংগ্রামের সমুদ্র পার হতে হয় তা কি ও জানে না? জানে। অবশ্যই জানে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কল্পনার সমুদ্র পার হতে লাগল বায়ান্ন নম্বরের নবনীতা সেন।

রমা দেবী ঘরে ঢুকলেন। ঘুরে দাঁড়াল নবনীতা। রমা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে, তোর কাছে চিঠি লিখল কে?"

"এখনো দেখি নি।"

দেখবার দরকার ছিল না। কল্পনার আকাশে কি প্রিয়তমের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায়? কিন্তু মাটির পৃথিবীতে নবনীতাকে নামিয়ে নিয়ে এলেন রমা দেবী। নিরঞ্জন গুপ্তের সব খবর দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর অমত নেই তো?"

হাসি পেল নবনীতার। যে-মানুষটা সাড়ে সাতশো টাকার ইস্পাতের তরোয়াল হাতে নিয়ে উড়ে আসছে বিলেতের বন্দর থেকে, তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা নবনীতার নেই। খণ্ডিত-বাংলা যে কত দুর্বল তা কি মা জানেন না? রাজনীতির তরোয়ালের চেয়ে নিরঞ্জন গুপ্তের তরোয়াল কি কম ধারালো? তবুও নবনীতা বলল, "যাকে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় তার মূল্য কত কম!"

"বলিস কি নীতা! সাড়ে সাতশো টাকা কি কম? তাছাড়া, দুর্গাপুরের জঙ্গলে টাকাপয়সা খরচা করবার সুযোগও বেশি নেই। প্রতি মাসে ব্যাঙ্কে তোদের টাকা জমবে।"

"তবু—" উসকোখুসকো চুলের গোড়ায় চিরুনীর দাঁত বসাতে বসাতে নবনীতা বলল, "তবুও অত সহজে আমি স্বামী পেতে চাই নি। আর দুটো বছর অপেক্ষা করলে কি চলতো না, মা?"

"তোর বাবা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কিনা···হ্যাঁরে, চিঠিখানা কোথা থেকে এল একবার দ্যাখ্ না।"

"কিছু দরকার নেই। ও কেতকীর চিঠি। হাতের লেখা আমি চিনি।"

"তাহলে উনি আজ কথা দিয়ে আসবেন তো? ভেবে বলিস।"

"ভেবে বলতে গেলে অন্তত দুবছর সময় লাগবে। হঠাৎ কথা দেওয়াই ভাল।"

রমা দেবী ছুটলেন স্বামীর কাছে। নিশ্চিন্ত বোধ করল নবনীতা। কেতকীর লেখা চিঠিখানা নিয়ে খানিকটা সময় আজ সে কল্পনার আকাশে উড়ে বেড়াতে পেরেছে। উড়তে ভাল লেগেছিল। যে-মেয়ে সারাজীবনে একবারও তার নায়কের উদ্দেশ্যে উড়তে পারে নি, সে শুধু বই মুখস্থ করতে পারে, বি-এ পাসও করতে পারে; পারে না কেবল সত্যিকারের জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে। নবনীতা আজ ঘুম থেকে উঠে সত্যিকারের জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেছে।

এবার কেতকীর চিঠিখানা খোলা দরকার। প্রায় এক বছর পর কেতকীর কাছ থেকে চিঠি পেল সে। ওর একমাত্র বাল্যবন্ধু কেতকী হালদার। একসঙ্গেই ওরা সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পাস করেছিল। কেতকী কলেজে ভর্তি হয় নি। ভর্তি হতে চায়ও নি সে। চাকরি পেয়েছিল। জীবনটা কতবড় তার একটা মোটামুটি পরিমাপ করবার উগ্র আকাঙ্ক্ষা ছিল ওর। যে-কোন একটি পুরুষের কাছে ধরা-দেওয়ার মত দাসমনোবৃত্তির প্রতি কেতকীর ছিল অপরিসীম ঘৃণা। ধরা সে একদিন দেবে। কিন্তু দেওয়ার আগে মানুষটিকে সে চিনতে চেয়েছিল। ভালবাসতে চেয়েছিল। হয়তো এতদিনে সে তার ভালবাসার মানুষটিকে খুঁজেও পেয়েছে।

কেতকী যেন নবনীতার গোপন আকাঙ্ক্ষাটুকু চুরি করে নিয়ে গেছে অনেকদিন আগে।

চিঠিখানা পড়তে লাগল নবনীতা। কেতকী লিখেছে, "—এবার দেশে ফিরছি। গত তিনমাস কাল আমি বিলেতেই ছিলুম। প্রায় সবগুলো মহাদেশই আমার দেখা হল।...মানুষ? হ্যাঁ ভাই, মানুষও কম দেখি নি। কলকাতা গিয়ে অভিজ্ঞতার কাহিনী সব ব্যক্ত করা যাবে।...কেমন আছিস? আশা করি, ভুল করে আবার বিয়ে করে বসিস নি। সভ্যদেশগুলোতেও আজকাল পুরনো বর্বরতা খুব দ্রুত ফিরে আসছে দেখলুম। কুড়ি-একুশ বছরের কচি কচি মেয়েরা ঝপ ঝপ বিয়ে করে ফেলছে।...আমি ২রা মে দমদম বিমানঘাঁটিতে গিয়ে পৌঁছব। সেইদিনই বিকেল পাঁচটা নাগাদ তোর সঙ্গে দেখা করব। আমি বি-এ-ও-সি'র প্লেনে চেপে আসছি। ওই কোম্পানিতেই আমি এখন চাকরি নিয়েছি। ইতি—"

কেনাকাটা শুরু-হয়ে গেছে। নতুন মোটরগাড়ি কেনবার টাকাও শৈলেশবাবু পৌঁছে দিয়ে এসেছেন নির্মল গুপ্তের কাছে। টাকা পেয়ে নির্মল গুপ্ত তাঁকে একটা রসিদও দিয়েছেন। পাকা রসিদ। নিরঞ্জন এখনো এসে পৌঁছয় নি। পৌঁছবার দিন ক্রমশই কাছে আসছে। বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে।

নবনীতা তার বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখে খবরটা জানিয়েছে। জানাবার জন্যেও তেমন কিছু উত্তেজনা বোধ করে নি। চিঠির ভাষায় তাই সামাজিকতার সুর ছাড়া আর কিছু রইল না।

হয়তো ছেলেবেলাতেই কেতকী ওর উত্তেজনার মোটা অংশটাই লুঠ করে নিয়ে গেছে।

তারপর সেই স্মরণীয় দিনটি এসে উপস্থিত হল। বিয়ের দিন নয়, নিরঞ্জন গুপ্তের পৌঁছবার দিন। নতুন মোটরগাড়ি চেপে নির্মল গুপ্ত বিমানঘাঁটিতে গিয়েছিলেন ছেলেকে নিয়ে আসবার জন্যে। শৈলেশবাবু যাননি। একটু আগেই তিনি পাম এ্যাভিন থেকে ঘুরে এলেন। স্ত্রীর কাছে পৌঁছে তিনি সানন্দে ঘোষণা করলেন, "নবনীতা ঠকবে না। বইবেচা পয়সা আমার কাজে লাগল। চমৎকার ছেলে নিরঞ্জন। ইস্পাত সম্বন্ধে এতবড় বিশেষজ্ঞ সে, কিন্তু পরিচয় হতে না হতেই নিরঞ্জন আমার পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলল। নিচু হতে তার এতটুকু কষ্ট হল না। ত্রিশ হাজারের এত ভাল লগ্নী সবচেয়ে বড় সমাজতান্ত্রিক দেশেও সম্ভব হতো না। দেখতেও খুব লম্বাচওড়া, গায়ের রং ফরসা—বাংলা নভেলের কোথাও তুমি এমন একটি নায়কেব সন্ধান পাবে না। নবনীতার পছন্দ হবেই। মনস্তত্ত্বের মারপ্যাঁচ আমি কিছু কম জানি না। পড়ুক নবনীতা যত ইচ্ছে বাংলা-নভেল।"

বমা দেবী যথারীতি খবরটা পৌঁছে দিয়ে এলেন নবনীতাকে।

নবনীতা কিন্তু অপেক্ষা করে বসে ছিল কেতকীর জন্যে। সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। সাতটাও বাজলো। এরই মধ্যে সে বার-তিনেক চা খেয়ে ফেলেছে। তবুও বার বার করে গলাটা

ওর শুকিয়ে উঠছে আজ। কেতকী না এসে পৌঁছলে যেন গলা ওর কিছুতেই ভিজবে না। উৎকণ্ঠিত হওয়ার সত্যিই কোন কারণ ছিল কিনা নবনীতা কিছুতেই তা ভেবে উঠতে পারল না। সাড়ে সাতটার একটু পরেই কেতকী হালদার এল।

বেশ খানিকক্ষণ নবনীতা একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল কেতকীর দিকে। চিনতে ওর সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। এ কোন্ কেতকী ? মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুর্ব-পরিচিতির একটা চিহ্নও সে খুঁজে পাচ্ছে না। চুল শুধু সে ছেঁটে ফেলে নি, পুরুষদের মত ঘাড়ের ত্বক্ শাদা। ব্লাউজের মত একটা জামা পরেছে বটে, কিন্তু কোনকিছু গোপন করবার স্বল্পতম প্রয়াস তাতে নেই। মেদ-মজ্জাহীন ঘাড়েব দুপাশ দিয়ে ফবাসী সিল্কেব দুটো সরু সুতো নেমে এসেছে নিচেব দিকে। কি উদ্দেশ্য নিয়ে যে সুতো দুটোকে নিচের দিকে নামানো হয়েছে, একাধিকবার পর্যবেক্ষণ করবার পরেও নবনীতা সঠিকভাবে তা বুঝতে পাবল না। এমন বিকৃত নারীদেহ সে এই প্রথম দেখল। জিজ্ঞাসা করল নবনীতা. "এ কি বে! এ কি হাল হয়েছে তোর ?"

'কেন, আমি তো বেশ হাল্কা বোধ কবছি। লম্বা চুল ছেঁটে ফেলেছি। লণ্ডনের এক নাপিতের দোকানে দাম দিতে হল পুরো এক পাউণ্ড। এদেশেব হিসেবে প্রায় পনেবো টাকা। তারপর ? কেমন আছিস বল। পুরনো বন্ধুদের মধ্যে তোকেই শুধু পেলুম। পেলুম মানে, অবিবাহিত অবস্থায় পেলুম। হোয়াট এ পিটি! শীলা, পদ্মা, টুটু, স্মলি এট্‌সেট্‌রা সবাই

বিবাহিতা। ওদের বাড়ি গিয়েছিলুম খোঁজ করতে। প্রত্যেকের দরজা থেকে ফিরে এলুম দুঃসংবাদ নিয়ে। টুটু আর স্মলির নাকি ছুটো করে সন্তান। ওয়াক্, থুঃ। এবার বল্ কোন্ কাহিনী শুনতে চাস।" এই বলে কেতকী হালদার ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মুখের প্রসাধন সব ঠিক আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে ফিরে এল নবনীতার খাটের কাছে। তারপর ওরই বিছানার ওপর এলিয়ে পড়ে মস্তবড় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল কেতকী হালদার।

নবনীতার যেন সহসা মনে হল, কেতকী ওকে মুক্তি দিচ্ছে। সেই লুণ্ঠিত-আকাঙ্ক্ষাটা ফিরে আসছে নবনীতার কাছে। ধৈর্য ধরল নবনীতা।

এপাশ ফিরে কেতকী বলল, "টুটু আর স্মলির সর্বনাশ তো চোখে দেখা যায় না। কাশ্মীর নিয়ে তোরা এত লড়াই করছিস, আর এই মেয়েগুলোকে বাঁচাবার জন্যে তোদের কৃষ্ণ মেনন তো একটা কথাও বলেন না? তুই নিজেই বা এসব চোখে দেখছিস কি করে, নীতা?"

নবনীতার বিস্ময় কাটতে সময় লাগল। তারপর সে ধীরে ধীরে বলল, "টুটু আর স্মলির কথা থাক্। তোর নিজের কথা শুনি এবার। কি করলি এই কটা বছর?

"চাকরি।"

"শুধু চাকরি?"

"না। পুরুষমানুষগুলোকে দরজা থেকে দূর দূর করে

তাড়িয়েও দিলাম। দিনরাত পুরুষমানুষদের ভিড় যেন ভাই লেগেই থাকত।"

"ভিড়ের বাইরে কাউকে দেখতে পাস নি, কাতু?"

কেতকী এবার খাটের ওপর থেকে নেমে এল। মুখের আকৃতি গেল বদলে। নবনীতা তার সরল চোখ দিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, কেতকীর গোটা অস্তিত্বটাই যেন আবছা হয়ে গেল ব্যর্থতার বাষ্পে। না-পাওয়ার আগ্নেয়গিরিটা বুঝি ওর বুকের তলা থেকে ধূম উদ্‌গিরণ করছে। আজকে আর ওকে বিয়ের খবরটা দেওয়া চলবে না। দিলে, চরম নিষ্ঠুরতারই প্রমাণ পাবে ও। নবনীতা আর যাই হোক, নিষ্ঠুর হতে পারবে না।

কেতকী এগিয়ে গেল খোলা দরজার দিকে। পেছন ফিরে বলল, "আজ চলি, নীতা। অন্য একদিন আসব। খুবই পরিশ্রান্ত আজ। তুই একলা। সেই জন্যেই তোর ঘরটা আমায় টানে।"

"অন্য একদিন আসিস কিন্তু। কিছুই তো শোনা হল না রে।"

"হ্যাঁ, অনেক কাহিনী শোনাব। তোকেই শুধু শোনাব। তোরও যদি বিয়ে হয়ে যায়, তা হলে কেন থাকব আমি এদেশে? কি করব এখানে? কেমন করে আমার সময় কাটবে, নীতা? গুড নাইট, বাই-বাই—"

কেতকী চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল একতলায়।

সুস্থ এবং স্বাস্থ্যসম্পন্নার পদক্ষেপের প্রমাণ পেলনা নবনীতা। শুধু সিঁড়ির পথটাই নয়, জীবনের সারা পথটাই যে কেতকী একা একা হাঁটছে তার একটা স্পষ্ট ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। বোধহয় কেতকী-জীবনের এই অসুস্থ-আলেখ্যটা নবনীতাকে আজ পর্যাপ্ত পরিমাণে সুস্থ করে তুলেছে।

নিরঞ্জন গুপ্তের ফোটোখানা মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এল সে। তারপর ফিরে-পাওয়া উত্তেজনার সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিয়ে নবীনতা সেই রাত্রেই বন্ধুদের কাছে আবার নতুন করে চিঠি লিখল, "বিয়েতে কিন্তু আসতেই হবে, ভাই। আমার নারী-জীবনের স্বর্গটি কি দেখবি নে তোরা ?"

দেখবে বৈকি। সবার কাছ থেকেই জবাব এল যে, বাচ্চাকাচ্চাদের সঙ্গে নিয়েই ওরা বিয়ে দেখতে আসবে। পদ্মা টেগোর কেবল পত্রোত্তরে জানিয়েছে, কোলে দুমাসের শিশু। পাথুরেঘাটায় বাপের বাড়িতে তাকে রেখে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মা টেগোর আসবে নবনীতার স্বর্গ দেখতে।

বিয়ের ক'দিন আগে কেতকী এসে উপস্থিত হল। আসতেই হল ওকে। সঙ্গে করে প্রজাপতির ছবি আঁকা হলদে রং-এর নেমন্তন্ন-চিঠিখানাও সে নিয়ে এসেছে। বিয়ের দিন এত কাছে এসে পড়েছিল যে, নবনীতা ওকে চিঠি পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। ছাপানো চিঠির সঙ্গে ব্যক্তিগত হাতেলেখা চিঠিও একটা সে

পাঠিয়েছিল। কেতকী আজ ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর এলিয়ে পড়ল না। ওর শাড়ি-পরার ধরন দেখে নবনীতা মনে মনে লজ্জা পেল খুব।

"অমন অবাক হয়ে কি দেখছিস? প্রশ্ন করল কেতকী। কোন-কিছু জবাব দেওয়ার আগে কেতকীই আবার বলল, "ইডেন উদ্যানের সেই স্মরণীয় দিনটির কথা মনে পড়ে? নিষিদ্ধ গাছের ফলটি খাওয়ার আগে পর্যন্ত আদম আর ইভ একে অপরের নগ্নতায় লজ্জা বোধ করতেন না। লজ্জা কাকে বলে তাও এঁরা জানতেন না। ফলটি খাওয়ার পরে লজ্জাবোধ এল। শিফন কিংবা জর্জেট তখন তৈরি হতো না। তাই তাঁরা ডুমুর গাছের পাতা সেলাই করে লজ্জা ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগলেন। নীতা, আমার শাড়িটা কি ডুমুর গাছের পাতার চেয়েও ছোট নাকি রে? হোক-না ছোট, আমার আদমটি তাতে আপত্তি করবেন না। তিনি আমার সবটুকুই ভালবাসেন।"

কেতকীর গলায় আজ নতুন সুরের ধ্বনি।

নবনীতা অনুরোধ করল, "তোর ভালবাসার কাহিনী আমায় শোনা, কাতু।"

হাতের মুঠোতে নেমন্তন্ন-চিঠিখানা চেপে ধরে কেতকী বলতে লাগল, "আমার নিজের বলতে কিছু আর নেই। ভাঁজ-পড়া গায়ের চামড়াটুকুও তাঁর। সব, স-ব দিয়েছি তাঁকে। বোধ হয় তিন মাস আগেকার কথা। হনলুলু থেকে উড়োজাহাজ ছাড়ল। এ-বন্দরে, সে-বন্দরে ওঠানামা করতে করতে পৌঁছলুম

এসে বিলেতে। মাই গুডনেস! এলুম, দেখলুম এবং জয়ও করলুম। মনে হল কদমগাছের ডালে বসে এতকাল তিনি আমার অপেক্ষায় বাঁশী বাজাচ্ছিলেন। আমি আসি নি বলে, এযাবৎকাল তিনি নাকি তাঁর চরিত্রটিকে লণ্ডনের যমুনায় কলুষিত হতে দেন নি। গাধার দুধের মত চরিত্র তাঁর শাদা। নীতা, সবটুকুই শুনতে চাস নাকি?"

নবনীতার মনের আকাশে তখন একখণ্ড কালো মেঘ জমেছে। তবুও সে বলল, "হ্যাঁ, সবটুকুই শুন্‌তে চাই।"

"তবে শোন্—" কেতকী উঠে পড়ল, "প্রেমে পড়লুম। আর তিনি তো পড়বার জন্যে অপেক্ষাই করছিলেন। তাবপব একসঙ্গে, এক-প্লেনে ফিরে এলুম কলকাতায়।"

"কেতকী! সত্যি বলছিস?"

"নীতা, পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করিস নে। খিদে পেলে জন্তুগুলো প্রেমের শেকলটিও চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। ব্রুট! এই সেই দুর্গাপুর জঙ্গলের নতুন সভ্যতার ছদ্মবেশী জানোয়ার—" এই বলে কেতকী বিয়ের চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝের ওপব। যাওয়ার আগে পা দিয়ে চিঠিখানা মাড়িয়ে গেল কেতকী হালদার।

নবনীতা বসে পড়ল মেঝেতে। চিঠিখানা তুলে নিল হাতে। প্রজাপতির পাখা কই? ছিঁড়ে গেছে। পাখা দুটোই শুধু ছেঁড়ে নি, কপালে ওর কেতকী হালদারের পায়ের দাগও লেগেছে। চোখের জল দিয়ে নবনীতা প্রজাপতির ব্যথা আর

অপমান সব ধুইয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। নতুন স্বর্গ রচনার প্রথম সিঁড়িটিতে কোলাহলের আর অন্ত নেই। হাত বাড়ালেই যাকে পাওয়া যায় তার মূল্য বোধ হয় কানাকড়িও নয়।

একটু বাদেই রমা দেবী ঘরে ঢুকলেন। তিনি বাইরে থেকে বলতে বলতে আসছিলেন, "হ্যাঁরে, কেতকী অমন ছুটতে ছুটতে বাইরে বেরিয়ে গেল কেন?"

নবনীতাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। মেয়ের মুখ থেকে প্রতিটি কথাই শুনলেন রমা দেবী। তারপর তিনি ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেলেন স্বামীর লাইব্রেরি-ঘরে।

শৈলেশবাবুও শুনলেন সব। দুম্ করে বায়ান্ন-নম্বর বাড়িটার ওপরে যেন ভারী ওজনের বোমা পড়ল একটা। বিনা নোটিশে বোমাটা ফেলে দিয়ে গেল কেতকী। পাশে দাঁড়িয়ে নবনীতার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীও যেন যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। ত্রিশ হাজারের লগ্নির চেয়ে নবনীতার জীবনটা কি বড় নয়?

"এখন কি এর ব্যবস্থা করবে?" জিজ্ঞাসা করলেন রমা দেবী।

"বিয়ে হবে না। হতেই পারে না। ওঁরা তো প্রায় পনেরো হাজার নিয়ে গেছেন। নিক, নিক—আমি আবার নতুন নতুন বই লিখব। টাকা আসবে। নবনীতা আমাদের একমাত্র সন্তান। ওর জন্যেই তো টাকা রোজগার করা। নইলে রাত

জেগে মনোবিজ্ঞানের বই আমি লিখতুম নাকি ? কালই আমি নির্মলবাবুকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেব, এ-বিয়ে হবেনা। নেভার, হতেই পারে না। ছেলেগুলো নাকি বিলেত যায় উচ্চশিক্ষার জন্যে !"

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নবনীতা শুনলো সব। ভেতরে এসে এবার সে বলল, "না বাবা, তা হয় না। হঠাৎ তুমি তাঁদের চিঠি লেখতে যেয়ো না। কাল-পরশু যখন হয়, নিরঞ্জনবাবু আর তাঁর বাবাকে এখানে চা খেতে ডেকো। আমি তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। কেতকীও আসবে। অবিশ্যি নিরঞ্জনবাবুদের আসবার কথা কেতকী আগে জানতে পারবে না। তুমি একটা চা-পার্টির ব্যবস্থা করো, বাবা।"

নবনীতা ফিরে গেল নিজের ঘরে। যে-স্বর্গ সে মনে মনে রচনা করেছে, তাও এত সহজে ভাঙতে দেবে না। সমুদ্র সাঁতরাবার কষ্ট সে পেতে চায়।

সন্ধ্যের একটু আগেই নিরঞ্জন গুপ্ত এল। নির্মল গুপ্ত আসেন নি। হঠাৎ তাঁর শরীরটা একটু অসুস্থ হওয়ায় তিনি আসতে পারলেন না, সেইজন্যে তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। নিরঞ্জনের মারফত মৌখিক ক্ষমাটা পাঠিয়ে দিলেই নির্মলবাবু অপরাধ-মুক্ত হতে পারবেন।

লাইব্রেরি-ঘরে এসে নিরঞ্জন বসলো। রমা দেবী এই

প্রথম ওকে দেখলেন। ভাল করেই দেখলেন। ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা একটি বাঙালী ছেলে। অত্যন্ত বিনয়ী এবং নম্র স্বভাবের বলে মনে হল রমা দেবীর।

শৈলেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "গাড়িটা কেমন চলছে?" লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখল নিরঞ্জন। সহসা জবাব দিতে পারল না। ছেলেটি তো ইস্পাতের মত কঠিন নয়। রমা দেবী বললেন, "গাড়িটা তো তোমার বাবাই পছন্দ করে কিনলেন। আমার ইচ্ছে ছিল, তুমি নিজে এসে দেখেশুনে কেনো।"

"তা হলে গাড়িটা কেনাই হতো না", নিরঞ্জন মুখ তুলে বলতে লাগল, "আপনাদের অনেক পয়সা আছে শুনেছি। সৎ কাজেরও তো অভাব নেই। বাবার ঘাড়ে জোর করে গাড়িটা না চাপালেই ভাল হতো। ও-গাড়ি আমি চড়ি না, চড়বও না। কিছুদিন চাকরি করলে আমি নিজেই একটা গাড়ি কিনতে পারব।"

মনোবিজ্ঞানের পি-এইচ-ডি শৈলেশ সেন চকিতের মধ্যে রমা দেবীর দিকে একবার দৃষ্টি ফেললেন। তারপর বিলেতে কি করে এবং কত পরিমাণ ইস্পাত তৈরি হয় সেই সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে আলোচনা করতে লাগলেন নিরঞ্জন গুপ্তের সঙ্গে।

এদিকে সন্ধ্যের একটু পরেই কেতকী এসে ঝড়ের মত উড়ে পড়ল নবনীতার ঘরে। এসেই প্রথমে সে ঘোষণা করল, "ভোর রাত্রে বি-এ-ও-সি'র প্লেন ছাড়বে। সিঙ্গাপুর চললুম। খুব

ইচ্ছে ছিল, নিরঞ্জন গুপ্তের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিয়ে যাই। কিন্তু সময় পেলুম না, নীতা। হঠাৎ চা খেতে ডেকেছিস কেন? কুমারী জীবনের নতুন শুরুটা সেলিব্রেট করছিস নাকি? বিয়েটা কি এখনো ভেঙে দিস নি?"

"না।—কিন্তু দেব। তোর সামনে আমি নিরঞ্জনকে দুএকটা প্রশ্ন করব।"

হাতঘড়ির দিকে দৃষ্টি দিয়ে কেতকী বলল, "আমার তো ভাই এখন সময় হবে না। সিঙ্গাপুর থেকে ঘুরে আসি—"

"তুই একটু বোস। নিরঞ্জন এখানেই আছে। আমি ছুটে গিয়ে ওকে নিয়ে আসছি। জাস্ট্ এ মিনিট—" নবনীতা লম্বা বারান্দা ধরে ছুটতে লাগল লাইব্রেরি-ঘরের দিকে।

নিরঞ্জনকে নিয়ে নবনীতা ফিরেও এল তক্ষুনি। এসে দেখল, কেতকী হালদার নেই। এ-বাড়ির কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। নিরঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে নবনীতার যেন সন্দেহ হল, কেতকী এখানে আসেনি। কেতকী নামে কাউকে বুঝি ও চেনেও না। তবে কি কোন বাংলা-উপন্যাসের চরিত্র এই কেতকী হালদার?

লাঞ্ছনার সমুদ্রটা সাঁতরে পার হয়ে এল বায়ান্ন-নম্বরের নবনীতা সেন।